

রোহিঙ্গা জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

নাফ নদীর ওপারে

আসাদ পারভেজ



নাফ নদীর ওপারে
রোহিঙ্গা জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
আসাদ পারভেজ



প্রকাশকের কথা

নাফ নদীর ওপারে চলছে এক নিষ্ঠুর বর্বরতা। সামরিক জাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত অং সান সুচি'র তথাকথিত নির্বাচিত সরকার আরাকানে কেয়ামতের আগেই যেন নামিয়েছে আরেক কেয়ামত। এ যেন রক্তপিপাসুদের রক্তোৎসব। এটা আরাকানের মুসলিম জাতিসত্তাকে নির্মূলের পরিকল্পিত গণহত্যা। শিশুদের হত্যা করে বুনা উল্লাসে মেতে উঠছে বৌদ্ধদের সন্ত্রাসবাদী দল। নিরস্ত্র যুবকদের ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। নারীদের গণধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে। লাখো বনি আদম জন্মভূমি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে মানবেতর জীবনযাপন করছে। একুশ শতকের পৃথিবীতে এমন এক নারকীয় তাণ্ডব দেখে ভাবতে হয়, পৃথিবীর বয়স বাড়ছে; পাল্লা দিয়ে পাশবিকতাও বেড়ে চলছে। কোনো কিছুতেই থামছে না বর্বর বর্মিজ বাহিনী। রক্ত নদীতে গোসল করেও তাদের রক্ত পিপাসা মিটেনি। বিশ্ববাসীর সকল অনুরোধ-আবেদন উপেক্ষা করে তারা এই রক্তখেলা অব্যাহত রেখেছে।

শিক্ষায় অনগ্রসর রোহিঙ্গা জাতি তাদের উপর চলমান ক্র্যাকডাউনের একাডেমিক ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে পারবে বলেও মনে হয় না। বাংলাদেশের প্রতিবেশী এই মজলুম মানুষদের উপর চলা ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্যাতনের রেকর্ড সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মূলত সেই দায় থেকেই তরুণ লেখক আসাদ পারভেজ লিখেছেন ‘নাফ নদীর ওপারে: রোহিঙ্গা জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ গ্রন্থ। আজ থেকে ৫০০ বছর পরের প্রজন্মও যেন বইটি পড়ে বুঝতে পারে একুশ শতকের শুরুর দিকে কীভাবে রোহিঙ্গাদের নির্মূলের ঘণ্য তৎপরতা চালানো হয়েছে। একই সাথে বর্তমান প্রজন্মেরও রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্যক জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বইটি রোহিঙ্গাদের জানতে একটা পূর্ণ প্যাকেজ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্মানিত লেখক আসাদ পারভেজ ভাই বইটি লিখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেছেন, দেশি-বিদেশি জার্নাল ও বই পড়েছেন। আমরা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আরাকানের মজলুমদের মুক্তি নিশ্চিত হোক, এই প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

০৬ মে, ২০১৮

বাংলাবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাস এক অজানা রহস্যে ঘূর্ণায়মান। সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পেছনে কালে কালে ধর্ম ও মহামানবদের আগমন ঘটেছিল। বর্তমান পৃথিবীর সকল গবেষণায় প্রমাণিত যে, নবি মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এক স্রষ্টাবাদী ধর্ম ইসলামের অনুসারীরা মুসলমান হিসেবে সুপরিচিত। অতি নিকটবর্তী সময়েও এই মুসলমান জনগোষ্ঠী জ্ঞান-বিজ্ঞান-ন্যায়বোধ ও সমরশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে শান্তিতে স্থায়ী ছিল।

মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ)-এর অনুসারী হিসেবে খ্যাত আরও দুইটি জাতি রয়েছে, তারা হলো-খ্রিষ্টান ও ইহুদি। যাদের অতীত অস্তিত্ব স্বীকার করে ইসলাম। কিন্তু ইসলামের আগমনে তাদের বিলুপ্তিও কামনা করে ইসলাম। আবার সকল ধর্মের স্ব-অবস্থাও বিশ্বাস করে ইসলাম। এটি প্রত্যাশার সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য রেখে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিপরীতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিকাশ প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম। যে ধর্মটি মূলত কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রচার করে না এবং স্বীকারও করে না। নেপালের কপিলাবস্তুরে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ সনে জন্মলাভকারী গৌতমের শিক্ষাদর্শন থেকে এই ধর্মমতের উৎপত্তি। আন্তিকতা দর্শনের কতিপয় ধারণা যেমন সৃষ্টির মতবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা, শেষদিনের বিচার, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রচার করে না এই ধর্মতত্ত্ব। এটি বস্তুত একটি আধ্যাত্মিক পথ এবং প্রজ্ঞা ও নীতিবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জীবন দর্শন।

সত্যিকথা বলতে বৌদ্ধবাদ কোনো ধর্মতত্ত্ব হতে পারে না। এটি শুধুমাত্র এক দর্শন। যা মানব জীবনের ইহজগতের ক্লেশ ও দুঃখ-কষ্ট সংক্রান্ত সমস্যার শিক্ষা দেয়।

এই দর্শনের প্রবক্তা বুদ্ধ শিক্ষা দেন যে, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের একমাত্র উপায় নির্বাণ অর্জন অর্থাৎ দুঃখ সৃষ্টিকারী ইচ্ছা আকাজক্ষায় বিনাস সাধন। আর তার জন্যে তিনি আটটি উপায়ে নির্বাণ লাভ করার কৌশল শুধু প্রচার করেছেন-সঠিক অনুধাবন, সৎপ্রতিজ্ঞা, সত্যবাচন, সৎকর্ম, সৎজীবন, সঠিক প্রত্যয়, সৎচিন্তা ও একাগ্রচিত্ততা।

পৃথিবীর মানব সমাজ যখন অন্ধকারে দিশেহারা সে সময় ৫৭০ সালে জন্ম নেয়া মহামানব নবি মুহাম্মদ (সা.) ৬১০ সনে আরবের বুকে এক স্রষ্টাবাদী মহান আল্লাহর পাঠানো পথের কথা প্রচার শুরু করেন। যে পথ সে সময়কার অন্ধকার দূর করে পৃথিবীকে করেছিল আলোকিত। সে পথের অনুসারীদের সাথে পৃথিবীর অসংখ্য ধর্মবিশ্বাসী আন্তিক ও নাস্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসে হৃদয় ছিল। তার কারণ ছিল মুসলমানদের বিজিত সময়ের সমর শক্তি কিন্তু আজ যখন মুসলমান এই জনগোষ্ঠীর সমরশক্তি হ্রাস পায় তখনই পৃথিবীর বুকে মানবসৃষ্ট অপরাধ গ্রাস করতে থাকে তাদেরকে।

ইরাক থেকে আফগানিস্তান, কাশ্মীর থেকে ফিলিস্তিন বসনিয়া-চেচনিয়া থেকে আরাকান সর্বত্র তারা-আজ নির্যাতিত। আমার এই বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার এক আলোচিত বিষয়। এটি এখন শ্লোগানই নয়, এক আর্দশিক মতবাদও। পৃথিবীর কার্যক্রমে রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এর আবেদন। এক শ্রেণির মানুষের মুখে এর জয়গান চলছেই, কিন্তু মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়ন-নির্যাতন ও অবিচার কোনোক্রমেই বন্ধ না হয়ে বেড়ে চলছে।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতি আরাকানিরা। তাদেরই জাতিগোষ্ঠীর জনগণ ৬১০ সন পরবর্তী সময়ে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচারিত আহবানে এই ধর্মের অনুসারী হয়। অতঃপর হাজার বছরের অধিক সময় ধরে মুসলমানরা আরাকানে বসবাস করে আসছে।

১৭৮৪ সনের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে বার্মার রাজা কর্তৃক স্বাধীনতা খর্ব পরবর্তী তাদের জীবন থেকে সুখ নামের অচিন পাখি হারিয়ে যায়। অতঃপর ১৮২৪ সনে ব্রিটিশ কর্তৃক জীবনের নব হরণ পরবর্তী ১৯৪৮ সনে আবারও বার্মার অধীন স্বাধীনতা ভুলগঠিত। এরই পরবর্তী সময়ে জীবন হয়ে উঠে তাদের এক অগ্নিকুণ্ড।

বার্মার সামরিক ও বেসামরিক প্রতিটি সরকারই তাদের ওপর নতুন করে শুরু করে নির্যাতন। সেই নির্যাতন কালক্রমে চলতে থাকে-১৯৫৮, '৭৮, '৯২, ২০১২, '১৬ ও '১৭ সালে। আর এতে সৃষ্টি হয় মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। জীবন বাঁচাতে নির্যাতিত এই মানুষগুলো শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে। ২০১৮ সনে এসে শুধু বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ।

তামাম পৃথিবী আজ এই জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর সবচাইতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করছে। এরপরও আমাদের মানবতার চোখ ঘুমিয়ে আছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার

কালো মানুষদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে যতটা ভেবেছি, তার চেয়ে কম শঙ্কিত হয়েছি আরাকানের মুসলিম নিধন নিয়ে। বিষয়টা হলো-ঠিক যেন নিজ ঘরের কাজের লোকটিকে অবহেলা করে অন্যের ঘরের বউয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো ব্যাপার।

আমরা চীন ও রাশিয়ার কমিউনিজম নিয়ে ভাবনায় থাকি। আমরা আমেরিকা ও ইউরোপের গণতন্ত্রের কথা ভেবে আনন্দ পাই। আবার মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রের গুণকীর্তন করি কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেয় পাশ্চাত্য দেশের ভাগ্যহত জনগোষ্ঠীর কথা ভাববার।

সত্যিকারার্থে মানবাধিকার নিয়ে এত বেশি রাজনীতি, কূটনীতি ও ব্যবসানীতি করে আজ আমরা মানবাধিকারকেই বিপন্ন করে তুলেছি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সীমান্তে একই জনগোষ্ঠীকে সীমান্তের দুপাড়ে বসবাস করতে দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এক দেশের নাগরিক। ভারত অঞ্চলে যারা নাগা তারা কিন্তু মিয়ানমারে কাচিন। ভারতে যারা মিজো নামে পরিচিত, মিয়ানমারে একই জনগোষ্ঠী সীন জাতি নামে পরিচিত। মিয়ানমারে শান জাতির এক অংশ থাই সীমান্তের অভ্যন্তরে থাই জাতি হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসে মগ নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী আরাকানে রাখাইন নামে পরিচিত, যাদের অনেকেই বাংলাদেশে মারমা নামে পরিচিত। তাহলে বাংলা ভাষাভাষী লোক কেন আরাকানে থাকতে পারবে না।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কোনোক্রমেই বাংলা ভাষায় কথা বলে না। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। কেবল নিজেদের ঢঙের উচ্চারণের সাথে চট্টগ্রামের ভাষার মিল রয়েছে। বার্মা সরকার যেভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আরাকান থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে পরিকল্পিত অত্যাচার ও নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ না করে আমরা যদি বিষয়টিকে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দিই। তাহলে ভবিষ্যতে আরাকানে আর কোনো রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকবে না।

মানবসৃষ্ট এই বিশাল শরণার্থীদের অধিকার নিয়ে কথা কেউ না কেউ বলতেই হবে। শরণার্থীদের প্রত্যাভাসনের দায়িত্ব পালন করতে হয় যে দেশে আশ্রয় নেয় সেদেশকে। অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর দায়দায়িত্বও অধিক হারে থাকে।

কারা রোহিঙ্গা এবং কেন এই সমস্যা? মিয়ানমারের সামরিক সরকারের নয়া নাগরিকত্ব আইন দ্বারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকারসমূহ বাজেয়াপ্তকরণ, ভূসম্পত্তির অধিকার তথা মৌলিক সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের করছে শরণার্থী। তাদেরকে এত বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতন তথাপি নিধন করছে, যাতে তারা বাধ্য হচ্ছে দেশত্যাগ করতে।

এই জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ও নির্যাতিত জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করতে নেমে যেসব তথ্য পেয়েছি। তাই লিপিবদ্ধের কারণ হয়েছে এই বইতে।

বইটির গবেষণা কাজে যারা আমাকে খুবই মূল্যবান সময় ও মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি মেধা ঋণে কৃতজ্ঞ। এ সময়ে মানসিক দিক থেকে সহযোগিতা করে যাওয়ার জন্য আমার প্রাণ প্রিয় নাতি মো. আবিরসহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে স্মরণ করছি। তা ছাড়া বইটি জনগণের পড়ার উপযোগী করে প্রকাশ করার জন্য গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষ করে স্মরণ করছি আমার মা-বাবাকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দোয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আজকের জায়গায় এনেছেন। এই বই থেকে আমি লেখকের অর্জিত আয়ের একটি অংশ সুরজ মিয়া ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমাজের কাজে ব্যয় করব। ইনশাআল্লাহ

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বার্মা রাষ্ট্রের আরাকান প্রদেশ। যদি ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর পর বিপর্যস্ত রোহিঙ্গা মানুষগুলো পানির বানের মতো বাংলাদেশে না আসত, তাহলে আমরা কতটুকুবা আরাকানের (বর্তমান রাখাইন) রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে সচেতনভাবে জানতাম? মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী আরাকান প্রদেশে যে গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেটা সুপরিচালিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এরূপ নিকৃষ্ট কার্যকলাপ মিয়ানমার সরকার অতীতেও করেছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অতীতে এসেছে। কিন্তু অতীতে এই ঘটনাগুলো বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজের দৃষ্টিতে পাকাপোক্ত হয়নি।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে তথ্য প্রবাহ অনেক বেশি জোরদার এবং সুগঠিত। বাংলাদেশের মিডিয়া তথা গণমাধ্যম, সমকালীন বিপর্যস্ত রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশনের সংবাদ ও সংবাদ ভাষ্য অথবা অনলাইন পত্রিকায় পরিবেশনগুলো চলমান ও অপস্রিয়মাণ। তাই সচেতন নাগরিক সমাজের প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ সূত্র, যেটা হাতের কাছে সব সময় থাকবে। এখানেই একটি মুদ্রিত বইয়ের উপকারিতা। ‘নাফ নদীর ওপারে’ নামের বইটি- এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা বিপর্যয় প্রসঙ্গে যে আগ্রহী ও ক্ষুধার্ত মনের চাহিদা মিটাবে।

লেখক আসাদ পারভেজ বয়সে তরুণ। তারণ্যের সুবিধাগুলো তথা Advantage তিনি পুরোপুরি ভোগ করেন। অনুসন্ধিৎসু মন, শারীরিক পরিশ্রমের সামর্থ্য, কিছু একটা করার আগ্রহ তার মধ্যে পুরাই বিদ্যমান।

তার লেখা বই প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল ও বাংলাদেশের সীমানায় প্রত্যেকেই আমরা বাংলাদেশি বাঙ্গালি ইতোমধ্যেই পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে। এই সাফল্য আসাদ পারভেজকে অনুপ্রাণিত করেছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এই বইটি উপস্থাপন করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটিও পাঠক প্রিয় এবং উপকারী হবে।

আমি নিজে যেহেতু বিষয়টিতে আগ্রহী, সেহেতু এই বইটির প্রতি আমার আগ্রহ আছে। আশ্বস্ত হয়েই আমি খুশিমনে এই ভূমিকাটি লিখলাম।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
মেজর জেনারেল (অব.)

সূচিপত্র

১. রোহিঙ্গা-পটভূমি'	১৫
২. আরাকানের পরিচিতি	২১
৩. আরাকান নামের উৎপত্তি	৫১
৪. আরাকানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৫৫
৫. আরাকানে মুসলমান আগমনের ইতিহাস	৭১
৬. আরাকানের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এগার রাজার শাসনকাল	৯২
৭. বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসক ও শাসনকাল	৯৪
৮. মুসলিম শাসনের স্বরূপ: জাবুক শাহ ও সিকান্দার শাহ (১৫৩১-১৫৯৩)	৯৭
৯. আরাকানে বর্মি শাসন ও পরাধীনতা	১১৫
১০. পবিত্র আরাকানের দখলদার বর্মি সরকারের সাথে কোম্পানির দ্বন্দের সূত্রপাত	১২৬
১১. প্রথম এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধ	১৩১
১২. দ্বিতীয় ইঙ্গ-বর্মি যুদ্ধ	১৩৭
১৩. তৃতীয় এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধ	১৩৮
১৪. আরাকানে ব্রিটিশ শাসন	১৪০
১৫. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ	১৪৪
১৬. ব্রিটিশ শাসনামলে বর্মি মুসলমানদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড	১৪৬
১৭. স্বাধীনতার পথে বার্মা (১৯৩৫-১৯৪৮), বার্মাতে ব্রিটিশদের ক্রমানুপাতিক ক্ষমতা হ্রাস	১৪৯
১৮. বার্মার জাতীয়তাবাদী শক্তির জাপান বিরোধিতা	১৫৫
১৯. বার্মায় মুসলিম সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থা	১৫৮
২০. বার্মায় মুসলিম কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ	১৬১

২১. ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনে বার্মার মুসলিম কংগ্রেসের অবদান	১৬৩
২২. ইউনিয়ন অব বার্মা	১৬৭
২৩. মুসলমানদের পক্ষে ঐতিহাসিক মামলা	১৭৮
২৪. নতুনরূপে বর্মি ক্ষমতায় উ-নু (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)	১৮১
২৫. নতুনরূপে বর্মি ক্ষমতায় জেনারেল নে-উইন	১৮৩
২৬. বাংলাদেশের জন্ম ও আরাকানি মুসলমান	১৮৯
২৭. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলের বাংলাদেশ ও নে-উইনের	১৯৩
২৮. অধীনে আরাকানি মুসলমান	
২৯. ১৯৮২ সনে নাগরিকত্ব আইনের খড়গ	১৯৯
৩০. শরণার্থীর সংজ্ঞা	২০৪
৩১. ১৯৮২ সনে আরাকানের মুসলমানদের সচেতনতা	২০৮
৩২. ১৯৮২-এর নাগরিকত্ব আইন পরবর্তী আরাকান (ক্ষমতার পালাবদলে রোষের শিকার রোহিঙ্গা জাতি)	২০৯
৩৩. রোহিঙ্গা ইস্যু : ২০১২	২২৯
৩৪. রোহিঙ্গা	২৪২
৩৫. রোহিঙ্গা সংকট- ২০১৭	২৪৫
৩৬. শেখ হাসিনা সরকার ও রোহিঙ্গা সংকট-২০১৭	২৬০
৩৭. রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিএনপি ও খালেদা জিয়ার কার্যক্রম	২৬৩
৩৮. রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের তৎপরতা:	২৬৬
৩৯. রোহিঙ্গা ইস্যুতে তুরস্কের ফাস্ট লেডির কার্যক্রম	২৬৯
৪০. রোহিঙ্গা সমস্যা ও প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে কথিত চুক্তির নামে অ্যারেঞ্জমেন্ট	২৮৩

‘রোহিঙ্গা-পটভূমি’

১৭৮৪ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখের পূর্বে, স্বাধীন আরাকানে নম্র-ভদ্র, নিরিবিলি নির্জনবাসী, সুখী ও শক্তিশালী এক জাতি ছিল; আদিবাসী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। উন্নত বীর সেই রোহিঙ্গা জাতি কী পরিমাণ অমানবিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, নিষ্ঠুরতম আঘাত এবং বহু সংকট ও সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি দিন পার করেছে, সেটা গোটা বিশ্ব আজ কমবেশি অবগত হয়েছে। স্বাধীন আরাকান আজ মিয়ানমার (সাবেক বার্মা)’র অধীন রাখাইন নামে পরাধীন। আরাকান আজ রাখাইন। বার্মা (মিয়ানমার) কেড়ে নিয়েছে তার স্বাধীনতা ও সুখী জীবন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে সরকার ও তার মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ জনগণ দ্বারা পরিকল্পিতভাবে আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম যে পরিমাণ নিধন চলছে, তা যে জাতিগত নিধন (Ethnic Cleansing) বা গণহত্যা (Genocide) আন্তর্জাতিক সকল মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতিসংঘের তা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ আজ আর নেই।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একজন মানব সন্তান হয়ে মানবতা, শান্তি ও অহিংসার মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে বলতে হয়- মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর সরকারের মদদে যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চলছে, তার জন্য বিশ্ব বিবেক আজ মানবতার কাছে অত্যন্ত লজ্জিত, ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত। রোহিঙ্গা বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও রোহিঙ্গা জাতির নাগরিকত্ব ও তাদের ওপর চলমান নির্যাতন বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। বিষয়টি ধর্মীয় ও মানবতার উভয় দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।

অন্যেষণে থাকা ব্যক্তির ১০টি নীতি বাক্যের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হলো; বৌদ্ধ ধর্ম। এ নীতি বাক্যসংবলিত ধর্মের প্রবর্তক মহামতি গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, ‘জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক’। বৌদ্ধদের পঞ্চাশীলের প্রথমশীল হলো; প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বৌদ্ধ শাসিত মিয়ানমারের আজকের আচরণে শুধু রোহিঙ্গা মুসলিম জাতির নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহই অসম্ভব না বরং বিশ্ববিবেক দ্বিখণ্ডিত। গৌতম বুদ্ধ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মিয়ানমারের বৌদ্ধ জাতির উগ্র আচরণে তিনি লজ্জায় আত্মহত্যার পথ খুঁজে পেতেন না। তিনি হয়তো বলতেন: এরা বৌদ্ধ না; এরা উম্মাদ ও বিবেকহীন মানুষ। মিয়ানমারের এই আচরণ সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য চরম লজ্জার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় সময়ে হতাশাগ্রস্ত বিশ্ববিবেকের মোড়ল মাথাগুলো এক হয়ে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যর্থ GIR (General International Recognition অর্থাৎ সাধারণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি) নামক সংস্থার সংস্কার ও নিষ্কলঙ্ক করে মার্জিত ও নতুনরূপে ৫টি স্থায়ী দেশ নিয়ে পুনর্গঠন করেন জাতিসংঘ (United Nation)। সে সময় জাতিসংঘ পুনর্গঠিত হয়েছিল, মানুষের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তথা মানবজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। সেই দিনের তুলনায় আজ বিশ্ব অতি আধুনিক ও বিবেকবান। তাহলে এমন সময়ে এ কী নিষ্ঠুরতা চলছে মিয়ানমারে।

কোনো তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই, পক্ষ-বিপক্ষ না থাকার পরও আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বিনা কারণে হিংস্র বৌদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিচার বহির্ভূত হত্যাযজ্ঞের এহেন দৃশ্য মানবতাকে কলঙ্কিত করে। একটি বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সরাসরি আক্রমণ ও ইন্ধনে বর্বরোচিত আচরণ বিশ্ববিবেক কখনো মেনে নিতে পারে না, মেনে নেয়া উচিতও নয়।

একটি রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নিয়ে নানা মত, দ্বন্দ্ব কিংবা কার্যকারণ থাকতে পারে, কিন্তু সে সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমাধানের উপায়ও আছে। উপায়গুলো হতে হবে শান্তি, অহিংসা ও মানবতার পথে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল বার্মাকে ব্রিটিশ-ভারত থেকে পৃথক করার পর ১৯৩৮ সালে আরাকানে বৌদ্ধ-মুসলিম মারাত্মক যে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বার্মার উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জাপানিদের বার্মা দখল করাকে সমর্থন করে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা নিধনে সেই সময় লিপ্ত হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মিয়ানমারে ১৯৫৮ সাল, ১৯৬২ সাল, ১৯৭৮ সাল, ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯২ সালের প্রথম কয়েক মাস, ২০১২ সালের শেষ দিকে এবং ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর, সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২৩ আগস্ট কফি আনান রিপোর্ট প্রকাশ পরবর্তীকালে ২৪ আগস্ট দিবাগত রাত ১টা,^১ থেকে অতীতের বীর ও সংখ্যাগুরু এবং বর্তমানের অতি দুর্বল রোহিঙ্গা জাতির ওপর মিয়ানমার সরকার যে বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে আমি বিবেক তাড়িত।

মিয়ানমার সরকারের এহেন বর্বরোচিত আচরণে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মুসলিম বিশ্ব (OIC), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বাঘা বাঘা পাশ্চাত্যের

^১ আহমদুল হাসান আসিফ ও নুরুল করিম রাসেল, দৈনিক যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

দেশগুলো ও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব তথা জাতিসংঘের-এ রোহিঙ্গা সংকটময় মুহূর্তে করণীয় কী? আমার এই প্রশ্ন বিশ্বের ৭৩২ কোটি মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বের কাছে।

আজ জাতিসংঘের চোখ ও মুখ বন্ধ কেন? বিশ্ব মানবতা ও মনুষ্যত্ব আজ কোথায়? সু চি, বারাক ওবামা, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, দালাইলামা, মালারা ইউসুফ জাইসহ বিশ্বের শান্তিতে ও বিভিন্ন অঙ্গনে নোবেল বিজয়ী গুণী ও বরেণ্য ব্যক্তির আজ কোথায়? দক্ষিণ আফ্রিকার টিটু কি আজ দেখতে পাচ্ছেন না? অমর্ত্য সেন কি ঘুমন্ত? কেন তাদের আজ এহেন নীরবতা? তাদের বিবেক, বুদ্ধি, চোখ কি আজ অন্ধ? তাদের মুখে আজ কি তালা? ২০১৫ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারের বহুল আলোচিত সাধারণ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সু চিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার দল জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের নির্যাতিত আদিবাসী মুসলিম সংখ্যালঘু জাতির ব্যাপারে কী করবেন? যাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়ন চলছে। উত্তরে তিনি বলেছেন, বার্মায় একটি প্রবাদ আছে; আপনাকে বড় সমস্যাগুলো ছোট করে ফেলতে হবে, আর ছোট সমস্যা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষ পদে না বসেও দেশ চালাচ্ছেন। কিন্তু বিধিবাম; আজও রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি বরং নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়েছে। তিনি এত দিন রোহিঙ্গা জাতির সমস্যা নিয়ে নিরাসক্ত ছিলেন, আর আজ তিনি নীরবে রোহিঙ্গা জাতির ওপর যে নির্যাতন চলছে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাই প্রশ্ন আকারে নির্যাতিত জাতির পক্ষে স্লোগান তোলে বলতে হয়; নোবেল কমিটির কি ভুল ছিল অং সান সু চিকে পুরস্কৃত করে? বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল তোমাকে বলছি, তোমার রেখে যাওয়া মুক্তিকামী কাভারি বাহিনী আজ কোথায়?

১৪০ থেকে ১৩৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর-এ রাষ্ট্রে শান রাজ্যে শান, কারেন রাজ্যে (খ্রিষ্টান) কারেন, কায়েহ রাজ্যে কাচিন (যাদের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারের ১৭ বছরের যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটে- ২০১১ সালে), শিন, নাগা (কাচিন) জনগোষ্ঠী ও আরাকান রাজ্যের আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে বর্মি জনগোষ্ঠীর তথা একগোষ্ঠীর সাথে অন্যগোষ্ঠীর কোনোকালেই সম্প্রীতি পূর্ণভাবে বজায় ছিল না। শতাধিক নৃ-গোষ্ঠীর এই বিশাল বহরকে একক জাতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় করণার্থে ঐক্য গড়ে তোলা সত্যিকারার্থে কঠিন, দুর্বোধ্য ও দুরূহ কাজ। তবে বার্মার স্বাধীন, পরাধীন, গণতান্ত্রিক ও সামরিক কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই এ কাজটি গত কয়েক শত বছরেও

কোনো দিনই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি। যার ফলে বার্মার বিশেষ করে পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যাশিত ইনসার্জেন্সি ও কাউন্টার ইনসার্জেন্সি সব সময়ই বিদ্যমান। বার্মার কারেন রাজ্যের কারেন জনগোষ্ঠী খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী, অন্যান্য রাজ্যে সামান্য কিছু প্রকৃতি পূজারি ও অধিকাংশ নৃ-গোষ্ঠীর জাত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শুধু আরাকান প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী রোহিঙ্গা^২ নৃ-গোষ্ঠীসহ বেশ কয়েকটি (খাম্বইক্যা^৩, জেরবাদী^৪ ও কামানচি^৫) নৃ-গোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম জাতি।

বার্মার সরকারি প্রশাসন গত দিনগুলোতে দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা ইনসার্জেন্ট দলগুলোর সঙ্গে শান্তি ও সমঝোতার জন্য বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসে কিন্তু কখনো রোহিঙ্গা মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় বসেনি। বরং আদিবাসী (Indigenous People) রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর গত প্রায় ৮০ বছর যাবত বার্মার রাষ্ট্রীয় সরকার ও বৌদ্ধ জাতি কর্তৃক আত্মসী আচরণ, কর্মকাণ্ড ও নির্লিপ্ত বর্বরোচিত হত্যা-ধর্ষণ ও নিপীড়ন অব্যাহত, চলমান ও বিদ্যমান রয়েছে।

তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে বার্মা সরকার কেন পৃথিবীর বুক থেকে ‘এথনিক ক্লিনজিং’ তথা একটি সম্প্রদায় ও একটি প্রতিষ্ঠিত জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের গণহত্যা ও ধর্ষণের মতো কাজগুলো এত সহজে করতে পারছে এবং করছে? এর উত্তরের জন্য কঠিন কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই, উত্তরটি সহজ। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে সিরিয়া-লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, লেবানন কিংবা তুরস্ক-পাকিস্তান-আফগানিস্তানসহ আমেরিকা-রাশিয়া, চীন-ভিয়েতনাম, জাপান-জার্মান সব স্থানেই আজ মুসলিম জাতি অসহায় ও অত্যাচারের শিকার। বিশেষ করে, পশ্চিমা বিশ্ব থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র ‘ইসলাম ফোবিয়া’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আজ। তা ছাড়া মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো OIC’র অধীনে এক না থাকতে পারাও এই জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি সমস্যা।

২. স্বাধীন আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশের রাজধানী শহর ছিল ম্রোহং। যা বর্তমানে পাথুরেকেল্লা নামে পরিচিত। আরাকানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী লেমুর (Lemro) তীরেই এই শহর গড়ে উঠেছিল। যা ছিল আরাকানের সর্বশেষ স্বাধীন রাজধানী। ইসলামের অনুসারী আরাকানের আদিবাসী মুসলিম জনগণ আরাকানের রাজধানী শহর ম্রোহং উচ্চারণ ভেদে রোহাং ডাকেন। এই রোহাংয়ের মুসলিম অধিবাসীদেরকে রোহাংবাসী না বলে রোহিঙ্গা বলা হয়। আরাকানের বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়াতে বর্তমানে আরাকানের মুসলিম বলতে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকেই বোঝানো হয়।

৩. আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলের সমুদ্রকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জেলে পেশায় নিয়োজিত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম খাম্বইক্যা।

৪. বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসকল মুসলিম জনগণ আরাকানে ১৪৩০ সনে পাড়ি জমায় এবং মগ ও বর্মি রমণীদের বিয়ে-শাদী করার ফলে বর্ণশঙ্কর যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, তারাই জেরবাদী নামে পরিচিত।

৫. ১৬৬০ সনের পূর্বে মোগল সুবাদার শাহজাদা সুজার সাথে যে সকল সঙ্গী আরাকানে প্রবেশ করে এবং তার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলে তারাই কামানচি (মুসলিম) নামে পরিচিত।

জাতিসংঘ শুধু ক্রীশ্চান ৪টি দেশ ও বুদ্ধিস্ট একটি রাষ্ট্রসহ পাঁচটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে ক্রীশ্চান ও বৌদ্ধ জাতির সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের যাবতীয় বড় বড় মানবাধিকার সংস্থাগুলো ক্রীশ্চান-ইহুদি ও বৌদ্ধ লবির আওতাধীন পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই মুসলিম জাতির। কেননা, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর পেট্রোডলার থাকার পরও স্বচ্ছ ব্যবহারের অভাবে মালিকানাধীন পেট্রোডলারের অধিকাংশ অর্থ ইসলাম ধর্ম বিরোধীদের হাতে সহজে চলে যাচ্ছে। অতঃপর নিজেদের সেই অর্থ ক্রীশ্চান-ইহুদি ও বৌদ্ধরা ব্যবহার করছে মুসলিম জাতি নিধনের পেছনে। মুসলিমরা অতীতের বীরের জাতি। বর্তমানে অসহায় ও দুর্বল জাতি।

যাহোক, বার্মা সরকার মনে করে, ২২ হাজার বর্গমাইলের আরাকান ভূমি থেকে প্রায় ২০ লক্ষ আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিতাড়িত করতে পারলে, বিশাল এই আরাকানসহ বার্মা রাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতে উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বার্মা সরকার অতি সচেতনভাবেই চায় যে, আদিবাসী রোহিঙ্গা জাতি যেন বর্তমানের মিয়ানমার রাষ্ট্রটি ছেড়ে অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো স্থানের খোঁজে চলে যায়। বার্মা সরকার মনে করে, রোহিঙ্গা শব্দের বার্মিজ অর্থ আদিবাসী (Indigenous People) মুসলিম।

কোনো একদিন শক্তি সঞ্চয় করে হয়তো রোহিঙ্গা জাতি আদিবাসীর দাবি তোলে একসময়কার স্বাধীন আরাকানকে পুনরায় স্বাধীন করার প্রয়োজনে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারে। অতএব, রোহিঙ্গা জাতির পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ডাক দেবার পূর্বেই, আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম জাতিকে আরাকান থেকে বের করে দিতে হবে। তাই মিয়ানমার সরকার ও তার দোসর সামরিক বাহিনী আরাকান প্রদেশকে রোহিঙ্গা জাতি মুক্ত করতে দৃঢ় ও পরিকল্পিতভাবে সংকল্পবদ্ধ। সেই উদ্দেশ্যেই অতি দুর্বল এই আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমার সরকার ও তার সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ জনগণের দিনের পর দিন আগ্রাসী, ধ্বংসাত্মক, সাম্প্রদায়িক, গণহত্যা, ধর্ষণ, ঘর-বাড়ি ও ধর্মীয় ইবাদতখানাগুলো জ্বালিয়ে দেয়াসহ লুটতরাজ, জুলুম-নিযার্তন ও পরিকল্পিত বর্বরোচিত আচরণ চলছে।

২৩৪টি রাষ্ট্রের পৃথিবীতে সার্বভৌম বা স্বাধীন ভূমি দাবি করে ২০৪টি ভূমি (রাষ্ট্র)। প্রশ্নবিদ্ধ বিশ্বগৃহ (জাতিসংঘ-United Nation) কর্তৃক অনুমোদিত স্বাধীন রাষ্ট্র সংখ্যা ১৯৫টি। যেখানে পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্র ১টি (প্যালেস্টাইন), বিশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র ১টি (ভ্যাটিকান সিটি) এবং পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র সংখ্যা ১৯৩টি। ফিলিস্তিন ও ভ্যাটিকান সিটি'সহ ১৯৫টি

স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়া তথা পৃথিবীর বুকে নিজস্ব তৈরি করা ‘এক বিপদ সংকুল রাষ্ট্রের নাম’। সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর বুকে সংকট মুক্ত জীবন ও অস্তিত্বের তাগিদে মানব সন্তানদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো বড় বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রয়োজনের তাগিদে মানব সন্তানগুলোর অধিকারকে নতুন ঠিকানা ও স্বাধীনতা দিয়ে নিজ রাষ্ট্র সীমানা সংযত ও নিরাপদ কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখতে পুরাতন রাষ্ট্র প্রশাসন বাধ্য আজ। সেখানে মিয়ানমার তার প্রতিহিংসা ও রাষ্ট্র সীমানা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি নামের আধ্যাক্ষরেও বার্মা নামের পরিবর্তে মিয়ানমার সংযোজন করে নামের বর্ণমালাতেও বর্ণবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

বর্তমানকালের মিয়ানমার রাষ্ট্রটি ১৪০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠীর বহর নিয়ে বিদ্যমান। ৬,৭৮,৫০০ বর্গ কি.মি. আয়তন নিয়ে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে পুরাতন কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য নিয়ে নতুন বার্মা নাম ধারণ করে এবং দখলবাজ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ১৯ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী এই রাষ্ট্রে ১৪০টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পার্লামেন্টে রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির মাধ্যমে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান ছিল। ১৯৮৯ সালের ১৮ জুন জাভা সরকার প্রতিষ্ঠাকালীন নাম বার্মার পরিবর্তন করে দেশের নতুন নামকরণ করেন ‘মিয়ানমার’।

মিয়ানমার নিয়ে লিখতে বসার পেছনে যে কারণটি জড়িত তা হলো, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংকটময় মুহূর্তে তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাদেরই সঠিক ও নায্য অতীত অস্তিত্বের সন্ধান করা। প্রশ্ন হলো- রোহিঙ্গা ভূমি ও মনুষ্য সন্তান বলে অতীতে কিছু বিদ্যমান ছিল কিনা? আমার গবেষণার কাজ হলো- তা অনুসন্ধান করে বের করা।

আরাকানের পরিচিতি

বর্তমানের আরাকান অঞ্চলটি ১৭৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে তৎকালীন বর্মিরাজ (ব্রহ্মরাজ) বোধপায়া (১৭৮২-১৮১১ খ্রি.^১ কিংবা ১৭৮২-১৮১৯খ্রি.^{১*}) যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে নিজ বাহুবলে করদরাজ্যে নিয়ে আসেন। বর্মিরাজ বোধপায়া সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানের শেষ রাজা থামাডাকে পরাজিত ও নিহত করে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে অদ্যাবধি সেখানকার প্রদেশ হিসেবে রয়েছে।^{১**} ঐতিহাসিক এ.পি. ফেয়ার আরাকানের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন রাজাদের ঐতিহাসিক ইতিকাহিনি মহারাজোয়াং (Maha Rajaweng) অবলম্বনে প্রাচীন আরাকানের রাজদরবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মারু বংশীয় প্রথম রাজার সিংহাসনে বসার যে সময়ক্ষণ উল্লেখ করেছেন^২। সে সময়কে ভিত্তি হিসেবে ধরে বলা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় চার হাজার চার শত পঞ্চাশ বছর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমণ্ডিত অপরূপ নৈসর্গিক শোভার আরাকান অঞ্চলটি ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীনসত্তা, নিজস্ব কালজয়ী সংস্কৃতি, সমাজবদ্ধ জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বহু ধর্মীয় জাতপাতের মানুষ নিয়ে নিরিবিলা সুখী ও শক্তিশালী এক আরাকানি জাতি ছিল। অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।^{২*}

অতীতের প্রায় ৪৪৫০ বছরের স্বাধীন আরাকানের ঐতিহ্য ও ইতিহাস পৃথিবীর বহু জাতির কাছে আজও অবিস্মরণীয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রায় ৪৪৫০ বছরের অতীতকালে আরাকান নামক এ অঞ্চলে বহু আদি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের প্রয়োজনে বসতি নিবাস গড়ে উঠে। প্রথমদিকে আদি এই মানুষগুলো প্রকৃতি পূজারি-জড়বাদী বিশ্বাসী থাকলেও সময়ের সাথে সাথে অধিকাংশ আদিবাসী বৌদ্ধ ও সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে পরিশেষে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্ম একটি দ্রুত বিকাশমান ধর্ম হওয়াতে শত বছরের মধ্যে আরাকান অঞ্চলটির অধিকাংশ

১. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৩।

১*. Abdul Mabud Khan, The Maghs (A Buddhist Community in Bangladesh), UPL. Dhaka, 1999, op. cit., p. 28.

১**. D.G.E.Hall, Burma (London: Hutchinson and Co. Ltd. 1960), p.62.

২. A.P. Phayre, History of Burma, op.cit., p. 43.

২*. D.G.E.Hall, A History of South-East Asia (London: Macmillan Press Ltd., 1994), pp.411-412.

আদিবাসী জনগণ (Indigenous People) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আরাকান অঞ্চলে একটি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আরাকান এলাকাটি বর্তমানে মিয়ানমারের (১৯৮৯)^{২**} ৭টি প্রদেশ (Constituent Stats) এবং ৭টি বিভাগের (Division) মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ (Province)। নৈসর্গিক আরাকান উপত্যকাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তঘেঁষা একটি অঞ্চল। অঞ্চলটি উত্তর অক্ষাংশের ২১°২০′ ও ১৬°২২′-এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৯২°২১′ ও ৯৫°২০′-এর মধ্যে অবস্থিত এবং আয়তন প্রায় ২২৭২০ বর্গ কিলোমিটার।^{১*} অপর এক তথ্যে দেখা যায়, আরাকানের অবস্থান ৯২° থেকে ৯৪.৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২১.৯° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।^{১*} ভিন্ন তথ্য মতে, আরাকান উত্তর অক্ষাংশের ১৭.১৫° ও ২১.৭০°-এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৯২.১৫° ও ৯৪.৫৫°-এর মধ্যে অবস্থিত।^{১**} আরাকান অঞ্চলটি নাফ নদী দ্বারা বাংলাদেশ থেকে এবং মূল ভূখণ্ড বার্মা থেকে পাহাড় দ্বারা বিচ্ছিন্ন।^৪

আরাকানের উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তঘেঁষা নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা পর্বতমালা (ম্যাগওয়ে, ব্যাগো ও আয়েইয়ারওয়াদি অঞ্চল)^A দ্বারা বেষ্টিত। এ সুদীর্ঘ, দুর্গম, সুউচ্চ ও বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত আরাকানকে মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।^৫

^{২**}. ১৯৮৯ সনের ১৮ জুন সরকারিভাবে বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয়েছে। দেশের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে বর্মি সরকার ঘোষণা করে বার্মায় কারেন, কাচিন, মন, বর্মি প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক বাস করে। বর্মিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কেবল তাদের নাম অনুসারে গোটা দেশের নামকরণ করা সম্ভব নয়। Far Eastern Economic Review, 29 June, 1989, p.14.

^{১*}. Abdul Mabud Khan, The Maghs: A Buddhist Community in Bangladesh (Dhaka: University Press Ltd., 1999), p. 3.

^{১*}. Imperialist Conspiracy in Greater Chittagong & Arakan; Editor: S M Nazrul Islam, p. 23.

^{১**}. আবদুল করিম, 'রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের ইতিহাস', পাক্ষিক পালাবদল, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ১৯৯২, পৃ. ২৮।

^৪. ইকতেদার আহমেদ : সাবেক জজ: সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক; সোমবার ৫ ডিসেম্বর ২০১৬, যুগান্তর।

^A. আরাকানের মজলুম মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস (নাফ তীরের কান্না), কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক, মাকতাবাতুস সাহাবা, পৃ. ২৪।

^৫. Abdul Karim, The Rohingyas: A Short Account of Their History of Culture (Chittagong: Arakan Historical Society, June 2000), p. 1.

নাফ নদীর তীর বরাবর বঙ্গদেশের সাথে আরাকানের অভিন্ন সীমান্ত রেখা ছিল, যা এখনো আরাকান (বার্মা) ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত রেখা। বিশেষ করে, বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত আরাকান অঞ্চলটিকে বঙ্গোপসাগর ও নাফ নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম মোহনাবেষ্টিত আরাকান-ইয়োমা নামের দীর্ঘ পর্বতশৃঙ্গ (ইয়োমা পর্বতশৃঙ্গের সর্বোচ্চ চূড়া ভিক্টোরিয়া শৃঙ্গের উচ্চতা ৩,০৩৬ মিটার বা ১০,০৪৯ ফুট)^৬ মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে। সহজ অর্থে, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব তীরঘেঁষে নাফ নদী থেকে ‘নেগারাইজ অন্তরীক্ষ’ পর্যন্ত এলাকাটিই আরাকান।^{৬*}

প্রাচীন আরাকান রাজ্য উত্তর থেকে দক্ষিণের উপকূল বরাবর বিস্তৃত ছিল। তথাপি ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আরাকান অঞ্চলটি মিয়ানমারের (ব্রহ্মদেশ) মূল ভূখণ্ড থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন উপত্যকা। মূলত উঁচু, খাড়া এবং দুর্গম আরাকান ইয়োমা পর্বতশ্রেণি আরাকান ও মিয়ানমারকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যদিও আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের একটি অংশ। দুটি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্য মাত্র তিনটি গিরিপথ আছে। তিনটি গিরিপথের মধ্যে মাত্র একটি গিরিপথ দিয়ে বছরের সব কটি দিন যাতায়াত করা সম্ভব। অবশিষ্ট দুটি (আন এবং টনগুপ) গিরিপথ দিয়ে বর্ষাকালে যাতায়াত এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় আরাকান এবং বার্মার স্থল পথে যোগাযোগ সশস্ত্রবাহিনী ব্যতীত অন্য সবার জন্য প্রায় নিষিদ্ধ। সুতরাং দুটি (আরাকান-বার্মা) অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষিত হয় নৌপথের মাধ্যমে।^৭

জলপথে উভয় অঞ্চলের মধ্যে জনগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও তা ছিল কঠিন ও অনিরাপদ। ফলে আরাকানের মূল জনগোষ্ঠী বার্মা থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন। মিয়ানমারের সাথে কঠিনতম যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলেই সুদীর্ঘকালব্যাপী আরাকান উপত্যকাটির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র ও নিরাপত্তা তথা স্বাধীনতা জিইয়ে রাখা সম্ভব ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে ঐতিহ্যগতভাবে নানান সুযোগ-সুবিধার কারণে মিয়ানমারের চেয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আরাকানের অতি নিকটবর্তী ও বন্ধুপ্রতিম অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে ছোটখাটো পর্বতমালা ও নাফ নদীর ব্যবধান ব্যতীত উভয়

^৬. আরাকানের মজলুম মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস (নাফ তীরের কান্না), কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক, মাকতাবাতুস সাহাবা, পৃ. ২৪।

^{৬*}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৩।

^৭. Dr. Abdul Karim, The Rohingyas (A Short Account of Their History and Culture), p.13.

অঞ্চলের (চট্টগ্রাম-আরাকান) এক গোত্রীয় জনবসতির তেমন আর কোনো অন্তরায় ছিল না। তাই চট্টগ্রামে অস্টিকাদি জনগোষ্ঠী ও আরাকানে ভোট চিনা গোত্রীয় কিরাত জাতীয় লোকদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।^৮

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর বহু রাজ দরবারের রাজদণ্ডের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক গতিশীল ও চলমান একটি প্রক্রিয়া। রাজ দরবারের অধীনে পরিচালিত রাষ্ট্র সীমানা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট সীমানায় বিশেষ করে নির্ধারিত থাকে। তবে ধর্মীয় কার্যক্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মনোবৃত্তি থেকে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিফলনে থেকে বর্তমান সব সময়েই রাষ্ট্র সীমানার পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। যুদ্ধ ও বিগ্রহ এক দিকে যেমন প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি ঘটাবে, অনুরূপভাবে দুর্বল দেশসমূহের রাষ্ট্র সীমানা সংকুচিত করা থেকে শুরু করে স্বাধীনতাও হরণ করেছে। পৃথিবীর বহু অতীত স্বাধীন রাষ্ট্র ও স্বাধীনচেতা জনগণের জন্য তা এক দুর্বিষহ ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করে। তেমন অতীতের গর্বিত ও সুখী-সমৃদ্ধি ক্রটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতি হলো; আরাকান ও আরাকানের জনগণ।

সময়ের পরিবর্তনে তাদের স্বাধীনতা যেমন করে হরণ হয়েছে, তেমনি ভূমি সীমানার বারবার পরিবর্তন আরাকানের ভূমির আয়তনকে করেছে সংকুচিত। আরাকানের রাজ্য সীমানার পরিবর্তনের পেছনে স্বাধীন ত্রিপুরা, প্রভাবশালী দিল্লির মোঘল সাম্রাজ্য ও বার্মার রাজদণ্ড পরিচালিত ক্ষমতার অপব্যবহার জড়িত। তাই আরাকানের নির্দিষ্ট আয়তন নির্ণয় করা একটি কঠিনতম কার্য। প্রথমদিকে বঙ্গের সাথে আরাকানের স্বাধীন সীমানার প্রায়ই পরিবর্তন হতো। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজাদের কর্তৃক একাধিকবার এবং ১৬০৭ সালের দিকে পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেস আরাকানি শাসকদের নিকট থেকে সন্দীপ দখল করেন।^৯ সর্বশেষ দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭)^{১০} আমলে সম্রাটের মামা ও বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের (The Viceroy of Bengal ১৬৬৩-১৬৭৮,^{১১} ১৬৭৯-১৬৮৮) পুত্র ও সুযোগ্য সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খানের হাত হয়ে আরাকানিদের কাছ থেকে ১৬৬৬ সালের ২৬ মতান্তরে ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম অঞ্চলটি

৮. আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামের ইতিকথা (আদিযুগ), ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪, পৃ. ১৬২।

৯. বাংলাদেশের সীমানার প্রত্যেকেই আমরা বাংলাদেশি বাঙ্গালি, পিস প্রেস লিংক, পৃ. ৪৩, মো. আসাদ পারভেজ।

১০. Hunter, W.W., Statistical Account of Bengal, V1, 3. London, 1876, p.272.

১১. Hunter, W.W., Statistical Account of Bengal, V1, 3. London, 1876, p.272.

উদ্ধার হয়ে বাংলার সুবাহের অধীনে আসে।^{১২} বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম জয় করে দিল্লির সাম্রাজ্যের ফরমান অনুযায়ী শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ইসলামাবাদ।^{১৩} বঙ্গের সাথে আরাকানের সীমানার প্রায়ই পরিবর্তনের যে খেলা চলত, ১৬৬৬ সালে তার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৫৮১ সাল থেকে ১৬৬৬ সালের ২৬ মতান্তরে ২৭ জানুয়ারি^{১৪} পর্যন্ত বঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আরাকানের দখলে থাকলেও অবশেষে ১৬৬৬ সালে তা বাংলার দখলে পুনরায় আসে।^{১৪#}

ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুকাল হতেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৬৬৬ সালের পূর্বে বাংলার কক্সবাজার, রামু, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিশাল ভূমি আরাকানের শাসনাধীনে ছিল এবং এই সময়ে ত্রিপুরা ছিল তার করদ রাজ্য।^{১৪*} ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খান পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকেই স্বাধীন আরাকানের ভূমির নির্দিষ্ট আয়তন নির্ধারিত হয় ২০ হাজার বর্গমাইল, যা ৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বার্মার চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৮৪ পূর্ব স্বাধীন আরাকান।

১৯৪৮ পরবর্তী সমগ্র আরাকান অঞ্চলের ৫,২৩৫ বর্গমাইলের পার্বত্য আরাকান উপত্যকাটি বার্মার আর একটি স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য চিন প্রদেশে (Chin Province)^{১৫} এবং দক্ষিণ আরাকানের ৫৬৫ বর্গমাইলের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি লোয়ার বার্মার ইরাবতি অঞ্চলের আওতাভুক্ত করার ফলে বর্তমানে আরাকানের আয়তন খর্ব হয়ে ১৪,২০০ (প্রায় ১৪,২০০.১) বর্গমাইলে বা ৩৬,৭৭৮ কি.মিটারে স্থিতিশীল হয়। আরাকানের প্রকৃত আয়তন ১৬,৫০০ বর্গমাইল, কিন্তু ১৯৭৪ সনে বার্মার সরকারি মানচিত্রে ও নথিপত্রে ১২,৬৪২ বর্গমাইল দেখানো হয়েছে।^{১৫*}

^{১২}. রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, এশিয়াটিক প্রেস, পৃ. ১, জুলাই ১৯৮৪।

^{১৩}. HB, vol. ii. pp. 234, 283; Abdul Mabud Khan, The Maghs, A Buddhist Community in Bangladesh, UPL, P.27.

^{১৪}. মো. আসাদ পারভেজ, বাংলাদেশের সীমানার প্রত্যেকেই আমরা বাংলাদেশি বাঙ্গালি, পিস প্রেস লিংক, পৃ. ৪৩।

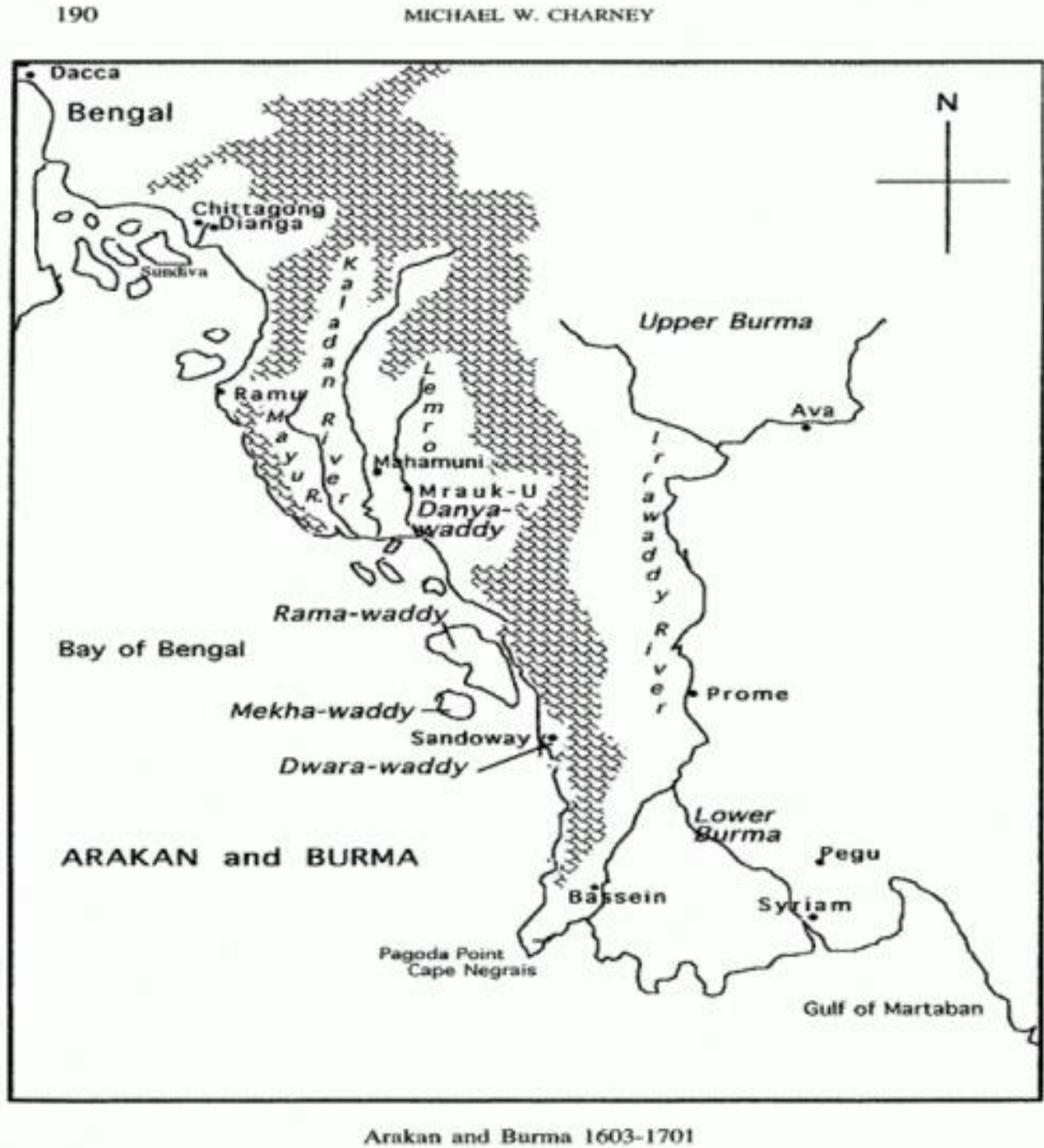
^{১৪#}. S.M. Ali, Arakan Rule in Chittagong, Journal of Asiatic Society of Pakistan, vol, xii. No. 3, 1967, pp. 331-351.

^{১৪*}. Ali, S.M., 'Arakan Rule in Chittagong' Journal of the Asiatic Society of Pakistan. Vol.XII, No.3 (Dec., 1967), pp.333-51; Karim, Khondkar Mahbubul The Provinces of Bihar and Bengal Under Shahjahan. (Asiatic Society of Bangladesh, 1974), pp.111-19.

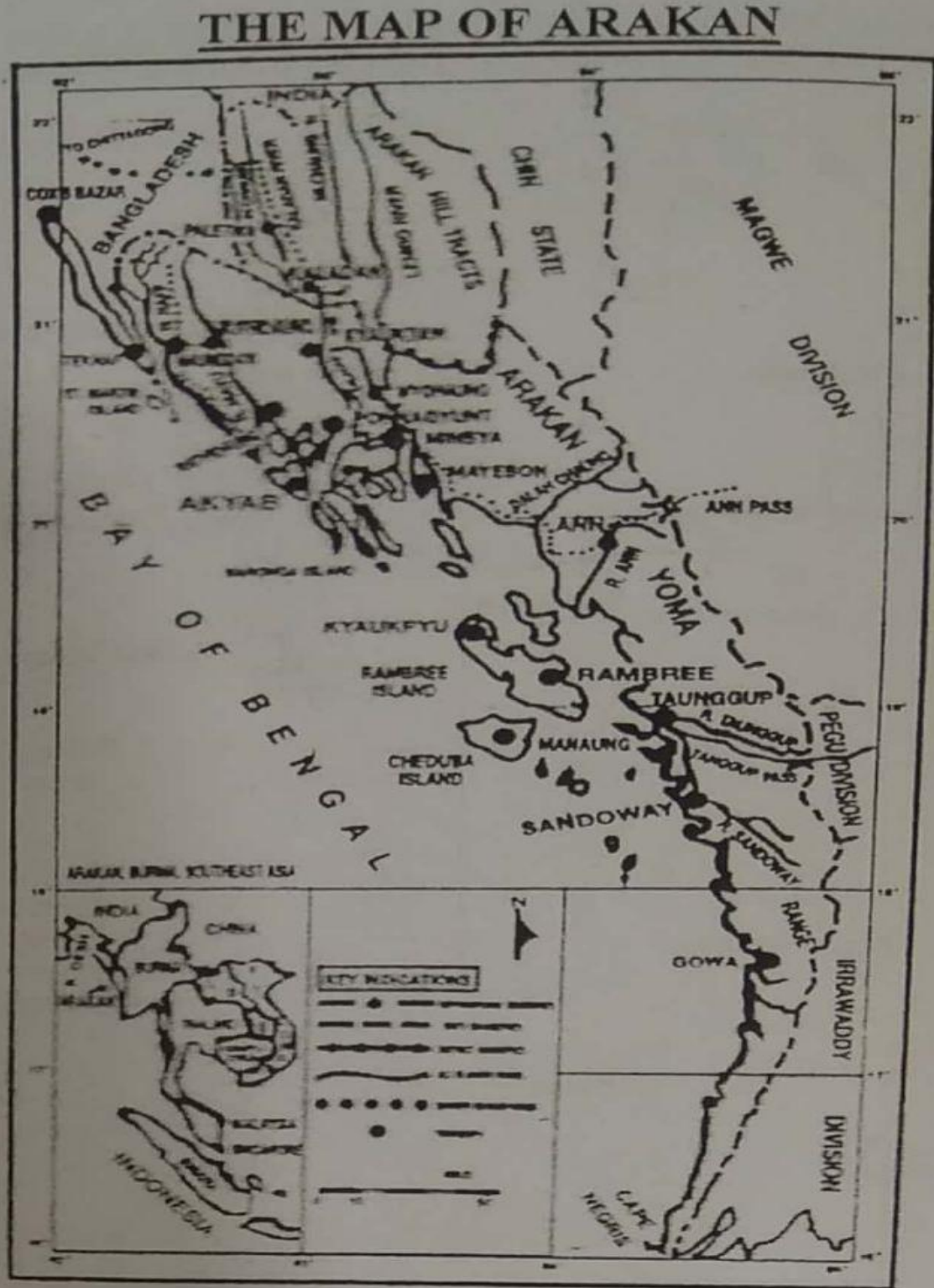
^{১৫}. Abdul Karim, The Rohingyas op.cit., p.2: A Short Account of Their History and Culture (CTG: Arakan Historical Society, June-2000).

^{১৫*}. বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

Ancient Arakan Kingdom about 17th Century A.D.



Source: [http://arakanindobhasa.wordpress.com/category/arakan-kingdom-map/Arakan Historical Society Of Chitagong](http://arakanindobhasa.wordpress.com/category/arakan-kingdom-map/Arakan%20Historical%20Society%20Of%20Chitagong).



Source:

John Bartholomew (ed.), *The Times Atlas of the World*, Mid-Century Edition (London : The Times Publishing Com. Ltd., 1958) , p-24

Arakan Map under British Administration



Source: <http://arakanindobhasa.wordpress.com/category/arakan-kingdom-map/>

১৪২০০ বর্গমাইলের বর্তমান আরাকানের মানচিত্রের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। এটি বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূল সংলগ্ন পাহাড়ি ভূমির সরু অংশ বিশেষ। কিন্তু প্রস্থে বিভিন্ন স্থান বিশেষে ভিন্নতা স্পষ্ট। উত্তর আরাকান উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত; যার প্রস্থ প্রায়

Map of Northern Rakhine state (Myanmar) with locations of Sittwe, Mrauk U, Vesali, Dhanyawaddy, Kyauk taw, etc. The map is not drawn to scale.



Source: <http://www.tourpagan.itgo.com/mrauk->

১০০ মাইল এবং দক্ষিণাংশে ক্রমাগতভাবে নিচের দিকে সরু হতে হতে প্রস্থ প্রায় ২০ মাইলে এসে স্থিতিশীল হয়েছে। এটি উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশকে, উত্তরে ভারতকে এবং উত্তর-পূর্বে চীন পাহাড়কে ছুঁয়েছে। আরাকানের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বতমালা আরাকান ইয়োমা এটিকে বার্মা থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রাকৃতিক মানচিত্রের রূপ দিয়েছে। সমগ্র আরাকান অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী নদী ও ভূমি সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।^{১৫**} ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদী এবং ৭১ মাইল দীর্ঘ দুলজ্য পর্বত্য সীমান্ত উভয় দেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে।^{১৬} আরাকানের ৩৬০ মাইল দীর্ঘ সরাসরি সংযোগের মধ্যে মাত্র ১৭১ মাইল দীর্ঘ জল ও স্থল সংযোগ রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে। বাংলাদেশ ও আরাকানের এই সংযোগ স্থলের কাছ ঘেঁষে বঙ্গোপসাগরের যে দীর্ঘ পথের উদ্ভব হয়েছে তাকেই Gate way to the Far East বলে।^{১৬*} আরাকানের মানচিত্রে তাকালে অনেকটা বোয়াল মাছের মতো মনে হয়।

বর্তমানের আধুনিক আরাকান অঞ্চলটি সুদূর অতীতে (Ancient Times) চারটি ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত ছিল। বিভক্ত সীমানা চারটি হলো- ১. ধন্যাবতি, ২. রামাবতি, ৩. মেখাবতি এবং ৪. দারাবতি। অতীতের ধন্যাবতি এলাকাটি বর্তমান আরাকানের রাজধানী এলাকা। রামাবতি বর্তমান রামব্রি দ্বীপ, মেখাবতি বর্তমানে চৌদুবা এবং দারাবতি বর্তমানে আধুনিক স্যাভুওয়ে।^{১৬**}

ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮২৬-১৯৪৭)^{১৭} বার্মা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের আওতাভুক্ত প্রদেশ বার্মার একটি বিভাগে পরিণত হয় পূর্বেকার স্বাধীন আরাকান অঞ্চলটি। বার্মার অধীনস্থ আরাকান বিভাগটি পুনরায় চারটি জেলাতে বিভক্ত ছিল। জেলাগুলো হলো-১. পার্বত্য আরাকান, ২. আকিয়াব, ৩. স্যাভুওয়ে এবং ৪. কাউকপিউ।

^{১৫**}. AFK, Jilani, 'A Brief Account of the Regional Geography of Arakan' (Physical Features) TMS (Photocopy), Special Collection, Arakan Historical Society Library, Chittagong, p.1.; The High School Geography of Burma (in Burmese), The Textbook Committee, Ministry of Education, The Socialist Republic of Union of Burma, Rangoon, 1975, p. 283.

^{১৬}. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আরাকান, সম্পাদনায় এস এম নজরুল ইসলাম, পাট-রোহিঙ্গা মুসলমান (সামিউল আহমদ খান), পৃ. ৩৬।

^{১৬*}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৪।

^{১৬**}. Abdul Mabud Khan, The Maghs: A Buddhist Community in Bangladesh, UPL, 1991, P. 4.

^{১৭}. Abdul Mabud Khan, The Maghs, UPL, p. 28.

নিকটবর্তী অতীতে আরাকান- স্যাভওয়ে, সিটওয়ে, মাযু এবং কিয়াউকপিউ নামক চারটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে আরাকান হলো পাঁচটি জেলায় বিভক্ত। এগুলো হলো-

১. সিতুই (আয়তন- ১২,৫০৪ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা- ১০,৯৯,৫৬৮ জন)। পূর্বের নাম ছিল আকিয়াব। সিতুই বা আকিয়াব (রাজধানী) শহর এবং আরাকানের প্রধান সমুদ্র বন্দর। এ ছাড়া আকিয়াব^{১৮} শহরটি কালাদান^{১৯} নদী মুখে অবস্থিত। যেখানে স্থাপিত হয়েছে আরাকানের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি। ঘাঁটি থেকে রাডার দিয়ে বাংলাদেশের কুমিল্লা সেনাঘাঁটি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ সম্ভব।
২. ম্রাউক-উ, যা সম্প্রতি সিতুই জেলা থেকে পৃথক করে গঠন করা হয়েছে।
৩. মংডু (আয়তন- ৩,৫৩৮ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা - ৭,৬৩,৮৪৪ জন)।
৪. কাউকপিউ (আয়তন- ৯,৯৮৪ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা- ৪,৫৮,২৪৪ জন)।
৫. থানদু (আয়তন- ১০,৭৫৩ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা- ২,৯৬,৭৩৬ জন)। সাকুল্যে আরাকান বা রাখাইনপ্রের মোট আয়তন ৩৬,৭৭৯ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা ২৬,১৮,৩৯২ জন।^{২০*}

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা বার্মাকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হলে আরাকান (রাখাইন প্রে) নামে বার্মার একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। তবে পূর্বেকার স্বাধীন আরাকান কিংবা আরাকান বিভাগের আয়তনের চেয়ে অনেক ছোট বর্তমান আরাকান প্রদেশের আয়তন। তারপরও এই আরাকানের রয়েছে বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ।

কৃষি, পশু ও বনাঞ্চল : পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধশালী দেশের ভূমির উর্বরতার চেয়ে আরাকানের জমি অধিক উর্বর। বহু নদী ভূমির এই উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সমুদ্রের সন্নিহিতে হবার ফলে-এ অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ মধ্যম প্রকৃতির, যা কৃষিনির্ভর কর্মের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আবার আরাকানের নানান অঞ্চল ভেদে মাটির প্রকৃতি ও উর্বরতা একেক স্থানে একেক রকম। এর কিয়দংশ এঁটেল মাটি এবং অবশিষ্ট এলাকার মাটির রকমভেদ

^{১৮}. আকিয়াব : আকিয়াব নামটির আসল উৎপত্তি অজানা। ঐতিহ্য অনুযায়ী বলা চলে যে Akyat-এর বিকৃতি নাম, একটি প্যাগোডা যা ভগবান বুদ্ধের চোয়ালের হাড় মাজার হতে অনুমিত হয় এবং এক আরাকানি রাজাদের দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরাকানরা মূলত একে Sittway বলে ডাকে।

^{১৯}. Abdul Mabud Khan, The Maghs, UPL, p. 4.

^{২০*}. এবনে গোলাম সামাদ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

দোআঁশ, পলি ও বেলে। একসময়ের রাজধানী আকিয়াবের রাখিদং ও গুরুত্বপূর্ণ শহর মংডু অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকার মাটি ‘বেলে’। এ ছাড়া আরাকানের বিশাল উপত্যকাসমূহের যে সকল উঁচু অঞ্চল রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বর্ষার প্রবাহমান পাহাড়ি ঢল ও পানির গতিময় প্রবাহ স্রোতের কারণে মাটির উপরি অংশে উর্বরতা তৈরি করে জমাট পলি মাটির সমৃদ্ধ অংশ।

আরাকানের অধিবাসীদের জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য যে অর্থনৈতিক শিল্প কার্ঠামো গড়ে উঠার কথা তা না হওয়াতে এখানের মানুষ স্বভাব-সুলভভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিই তাদের প্রধান পেশা হিসেবে গৃহীত। তবে ঐতিহ্যবাহী আরাকান অঞ্চলে গোলযোগ থাকার ফলে আবাদযোগ্য সমস্ত জমিই কৃষি কার্যের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আবাদযোগ্য ৯,৫৪,২৫৭ একর জমির মধ্যে মাত্র ৮,৫৪,৭২৪ একর জমি চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়।^{২০} রেকর্ড অনুযায়ী ৯,৬৪,২৫৭ একর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে প্রতিবছর মাত্র ৮,৫৪,৮২৪ একর জমি চাষ করা হয়ে থাকে, যা আবার বছরে মাত্র এক ফসল ফলানোর সুযোগ থাকে।^{২০*} তা ছাড়া বর্তমান সময়ে অত্যাচারিত শাসকগোষ্ঠী এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে মুসলমান বিহীন জনবসতিতে পরিণত করতে মুসলমানদের বিতাড়িত করে রাখাইনদের পুনর্বাসনে সচেষ্ট। এতে আক্রান্ত হয়ে মুসলমান আদিবাসী গোষ্ঠী বিতাড়িত হবার ফলে কিংবা স্থানীয় ভূমির মালিক বহু মুসলমান কৃষক জীবন রক্ষার্থে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালাচ্ছে। এ সুযোগে মুসলমানদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে বার্মার সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মগদের এনে পুনর্বাসিত করছে। যার ফলে সামগ্রিকভাবে বর্তমানে কৃষি জমি আবাদহীন হয়ে পড়ছে। তবে সমগ্র বার্মার তিন চতুর্থাংশ জনগণ সামগ্রিকভাবে কৃষি কর্মের সাথে সম্পৃক্ত।^{২১}

আরাকানের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ধান, ভুট্টো, তামাক, আলু, আখ, বেগুন, বাঁধাকপি, টমেটো, চীনাবাদাম, গাজর, ফুলকপি, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, রসুন, পেঁয়াজ, লিচু, কলা, বাতাবি লেবু, তরমুজ, জলপাই, বরই, নারিকেল ও কমলালেবুসহ নানান জাতের শস্য, শাকসবজি ও ফলমূল জন্মে। ১৯৮০-এর দশকে উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চলে বার্ষিক উদ্ভূত ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লক্ষ টন,

^{২০}. Jilani, op.cit, p. 25 এবং ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, পাতা-২৫।

^{২০*}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৭৮।

^{২১}. কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক, নাফ তীরের কান্না, পৃ. ২৬।

যেখানে চল্লিশ বছর আগে আরাকানে ৪,৫০,০০০ টন উদ্ভূত ধান উৎপাদন করত।^{২২} বিশেষ করে আরাকানের চাল বিশ্বব্যাপী এত বেশি জনপ্রিয় ছিল যে, পৃথিবীর অনেক দেশে উদ্ভূত চাল রপ্তানি করা হতো বলে, ঐতিহাসিকভাবে আরাকান অঞ্চলকে ধন্যাবতী (Granary of Rice) নামে ডাকা হতো।^{২২*}

বর্তমান সময়ে মুসলমান ভূমি মালিকদের বিতাড়িত করে চাষাবাদের প্রতি অনাগ্রহী ও অলস বৌদ্ধদের বসানোর ফলে আরাকানে চালসহ যাবতীয় উৎপাদনকার্য অনেক হ্রাস পেয়েছে। আরাকানের ভূমিতে আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ন্যায়-নিষ্ঠভাবে বসবাসের সুযোগ দিলে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলে, আরাকানের ভূমিতে প্রতিবছর উদ্ভূত চাল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ লক্ষ টনের অধিক। সমগ্র আরাকানে সর্বসাকুল্যে ৩৩টি রাইস মিল রয়েছে। গোটা আরাকানে গৃহস্থ ফলন হিসেবে ক্ষুদ্র পরিসরে নারিকেল চাষ হয় এবং বার্ষিক মোট নারিকেল উৎপাদন অনুমান করা হয়েছে প্রায় ১৫ মিলিয়ন।^{২২**} আরাকানের স্যাভুয়ে ও গোটয়া শহরে দড়িকল থাকলেও সমগ্র আরাকানে একটিও সাবান ফ্যাক্টরি নেই। যদিও প্রচুর পরিমাণ নারিকেল দিয়ে তৈল ও সাবান উৎপাদন ও প্রস্তুত করা সম্ভব।

আরাকানের অধিকাংশ পরিবার গৃহপালিত পশু লালন-পালনের সাথে জড়িত। গৃহপালিত পশু হিসেবে তারা গরু-মহিষ-ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি পালন করে। এ সকল গৃহ পালিত পশুর মধ্য থেকে গরু ও মহিষকে তারা কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করে। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক যন্ত্রপাতি আসাতে চাষ পদ্ধতিতে গরু-মহিষের লাঙ্গল কম ব্যবহার হচ্ছে। তবে আরাকানে সরকারিভাবে কোনো পশু লালন-পালনের খামার নেই।

আরাকানের রয়েছে বিশাল বিশাল পাহাড়ি এলাকা। এ সকল পাহাড়ি এলাকা গহীন ও গভীর বনাঞ্চলে বিস্তৃত। গহীন জঙ্গলাপূর্ণ এই পাহাড়ি অঞ্চল পশুর রাজা টাইগারসহ চিতাবাঘ, হরিণ, ভাল্লুক, বুনো শূকর এবং বুনো হাতি রয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ব পরিচিত ইয়োমা পর্বতের গহীন জঙ্গলে হাতি, গভার, বুনো গোখরা সাপসহ নানান প্রজাতির মারাত্মক বিষধর সাপ এবং বিশেষ করে স্রোতস্বিনী নদীর মোহনায় কুমিরও রয়েছে।

^{২২}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৭৮।

^{২২*}. Jilani, 'Regional Geography of Arakan', p. 7.

^{২২**}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৮০।

১৪২০০ বর্গমাইলের আরাকান অঞ্চলের প্রায় ৭০% (৯৯৪০ বর্গমাইল) পাহাড় ও গভীর বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ। এ সকল বনাঞ্চলের গহীন অংশে উন্নতমানের কাঠ উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া আরাকানের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে যে পরিমাণ সেগুন কাঠ উৎপন্ন হয়, তা মিয়ানমারের মোট উৎপাদিত কাঠের প্রায় ১৫ শতাংশ।^{২৩} পাহাড় সমৃদ্ধ আরাকানে সেগুন ছাড়াও পিনকেডু নামে পরিচিত লৌহ কাঠ (Iron Wood), বাঁশ, দারুচিনি ও ওক গাছসহ প্রচুর পরিমাণে বনজ ও ঔষধি গাছ জন্মে।^{২৩#} এ সকল পাহাড়ের বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ মধু উৎপন্ন হয়। বাঁশবন অনাহরিত ও অনাবাদী থেকে যাবার পরও এখানে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরাকানের বাঁশ বিশ্ববাজারের জন্য সর্বোত্তম মানের। উপযুক্ত স্থানে কাগজের মিল বসানো হলে, কাগজ উৎপাদন বাংলাদেশের বিখ্যাত কর্ণফুলী পেপার মিলকেই ছাড়িয়ে যেত এবং উত্তর আরাকানের ভূমি রাবার ও চা প্লান্টের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

আরাকানের কয়েকটি শহরে সরকার টিম্বার তৈরির জন্য সমিল বসিয়েছে। কিন্তু উত্তর আরাকানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, যেখানে বিভিন্ন জাতের উন্নতমানের কাঠ জন্মে সেখানে সরকারিভাবে একটি সমিলও বসানো হয়নি। তারপরও রোহিঙ্গারা শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে টিম্বার তৈরি করে। কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ ও বৌদ্ধরা তাদের এ সকল কাজে সব সময় বাধা দেয়।

নদী ও মৎস্য : আরাকানের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। আরাকানের শহর মংডু থেকে আরম্ভ করে ওয়াচং হয়ে ইরাবতি অঞ্চলের (বিভাগ) থাবাং সীমান্তঘেঁষা এলাকা কিয়াকচামচং পর্যন্ত আরাকানের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইলব্যাপী অসাধারণ মনোরম সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল। সাগর তীরে অবস্থিত হওয়ায় সামুদ্রিক জাহাজগুলোর জন্য নোঙর বাঁধার স্থানসহ আরাকানে একাধিক সমুদ্র বন্দর ছিল। দেশটি বহু নদী ও স্রোতস্বিনী দ্বারা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত। এই বিশাল জলরাশির সীমারেখায় আরাকানে মোট সাতটি গুরুত্বপূর্ণ নদী প্রবহমান রয়েছে। নাফ, মাযু, কালাদান, লেমব্রা, তানগু, অনন ও স্যাডুওয়ে। তার মধ্যে নাফ, কালাদান, লেমব্রা ও মাযু হলো আরাকানের গুরুত্বপূর্ণ চারটি নদী। নাফ নদীর প্রায় ৫০ মাইল দৈর্ঘ্যের বিপরীতে প্রস্থ মাত্র ১ থেকে $1\frac{1}{2}$

^{২৩}. ইসলামি বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৯৬, পৃ. ৭১৭।

^{২৩#}. আবদুল করিম, পালাবদল, পৃ. ২৮।

মাইল।^{২৩*} ক্ষুদ্র প্রস্থের এই নদীর পানির প্রবাহ ভালোই খরস্রোতা। মূলত এই নাফ নদীর জলরাশি বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যে সীমারেখার যে বিভেদ, তাতে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে কাজ করে।^{২৩**} নাফ নদীর পূর্ব তীরেই আরাকানের গুরুত্বপূর্ণ শহর মংডু টাউনশিপ এবং পশ্চিম তীরে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ থানা ও আশপাশের অঞ্চল। বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র সেন্টমার্টিন (জিনজিরা) নাফ নদীর সম্মুখভাগে অবস্থিত। মূলত আরাকানের হবিপাড়া থেকে আগত মুসলমানরাই এই সেন্টমার্টিনের অধিবাসী। সাবিবিনিইন, উশিঙ্গা, পরমা, মায়ুথিট, মিংলাগুই, পিনবায়ু, তাতমাগি, কাইন, গদুছারা, তুন এবং ঘাকুনডু নানান ছোট ছোট প্রবহমান নালা ও হ্রদ মায়ু পর্বতে উৎপন্ন হয়ে মংডু টাউনশিপের মধ্যে দিয়ে নাফ নদীতে মিশে নাফ নদীকে করেছে সমৃদ্ধ। নাফ নদী সর্বশেষ মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে।

ইয়াহু অঞ্চলের চিন পাহাড়ের কেন্দ্রস্থল থেকে বইনু নামে উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণের দিক দিয়ে পার্বত্য আরাকানে প্রবেশের পরে এটি কালাদান নাম তৈরি করেছে। এই কালাদান নদীটি আরাকানের বড় ও প্রধান নদী। কালাদান নদীটি দক্ষিণাভিমুখে শুরু করে অতঃপর উত্তর অভিমুখে এবং সর্বশেষে পূর্ব দিকে বাক নিয়ে সরাসরি লুসাই পাহাড় অতিক্রম করে পুনরায় দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে উত্তর আরাকানের শেষভাগ হয়ে আরাকানের পূর্ব অংশে চলে যায়। নদীটি রাজধানী বন্দর আকিয়াবের নিকটবর্তী স্থানে আসার পর বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। বর্মি ভাষা কালাদান বলতে বিদেশিদের স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেননা, বর্মি ভাষায় কালা অর্থ বিদেশি এবং দান অর্থ স্থান। অনেকে আবার বলেন, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আরাকানিরা পর্তুগিজ জলদস্যুদের সহযোগিতায় দক্ষিণ ও বাংলার নদী উপকূলবর্তী এলাকাগুলো হতে সাধারণ জনগণ অপহরণ করে নাফ নদীর সীমানা থেকে কালাদান নদীর এলাকা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সীমানায় অপহরণ লোকগুলোকে ধানসহ নানান কৃষি কাজে ভূমিদাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এতে করে এই নদীর নাম ধারণ করে কালাদান।

^{২৩*}. AFK Jilani, The Rohingyas of Arakan: Their quest for Justice, (Chittagong: Ahmed Jilani, 1999), p. 18.

^{২৩**}. Jilani, Regional Geography of Arakan, P.4; Mohammed Yunus, A History of Arakan: Past & Present (Chittagong: Magenta Colour, 1994), p. 2.

প্রায় ১৪৪ মাইল দৈর্ঘ্যের^{২৪} সীমানা নিয়ে লেমব্রা আরাকানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। আরাকানের ইয়োমা পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকার পানি গ্রহণপূর্বক উত্তর আরাকান দিয়ে আরাকানের রাজধানী আকিয়াব শহরটির ১০ মাইল উত্তর অংশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এটি এমন একটি নদী যে নদীর তীরেই একসময় গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নগরী বৈশালী, লংগিয়েত, পেরিন এবং ম্রাউক-উ রাজবংশের রাজধানী শহর মোহং। এই মোহং থেকে রোহিঙ্গা শব্দের মূল উৎপত্তি; যা বর্তমানে পাথুরে কেল্লা নামে সকলের নিকট পরিচিত। এ ছাড়া প্রায় ১০ মাইল দৈর্ঘ্যের মায়ু নদীটি আরাকানের রাখিদং ও বুচিদং টাউনশিপের মধ্যস্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর কালাদান নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে উপনীত হয়েছে। এ সকল নদীর জলরাশির উপর নির্ভর করে আরাকানের বিশাল এক জনগোষ্ঠী। মাছ সংগ্রহকে তাদের জীবন ও জীবিকার প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ৩৬০ মাইল বিস্তৃত জলরাশির বিভিন্ন মোহনায় প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা পড়ে। আরাকান হলো গহীন বনাঞ্চলের পাশাপাশি বিশাল জলরাশির মালিক। অনেকে আরাকানকে নদীমাতৃক বলে থাকে। নদীমাতৃক আরাকানের নদীগুলোতেও পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়।

নাফ ও কালাদানের মতো নদীর বুক থেকে যেমনি মাছ পাওয়া যায়, তেমনি তাদের উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘের থেকে প্রচুর পরিমাণ উন্নতমানের চিংড়ি উৎপন্ন হয়।^{২৪*} G Qvov আরাকানের বহু পুকুর ও ডোবাতেও মাছ চাষ বেশ জনপ্রিয় একটি কাজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু উন্নত যন্ত্রপাতি বিশিষ্ট মৎস্য ট্রলারের অভাব এবং মুসলমানদের উপর মাছ ধরার ক্ষেত্রে বহু বাধা-নিষেধ আরোপের ফলে এখানে মৎস্য আহরণের পরিমাণ প্রতিবেশী বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। মুসলমানদের মালিকানাধীন চিংড়ি বাঁধগুলো বার্মার বর্ণবাদী সরকার জোরপূর্বক নিয়ে ফেলার কারণে ১৯৮২ সাল থেকে চিংড়ি উৎপাদন অনেক ব্যাহত হয়ে কমে আসে।

^{২৪}. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২৪।

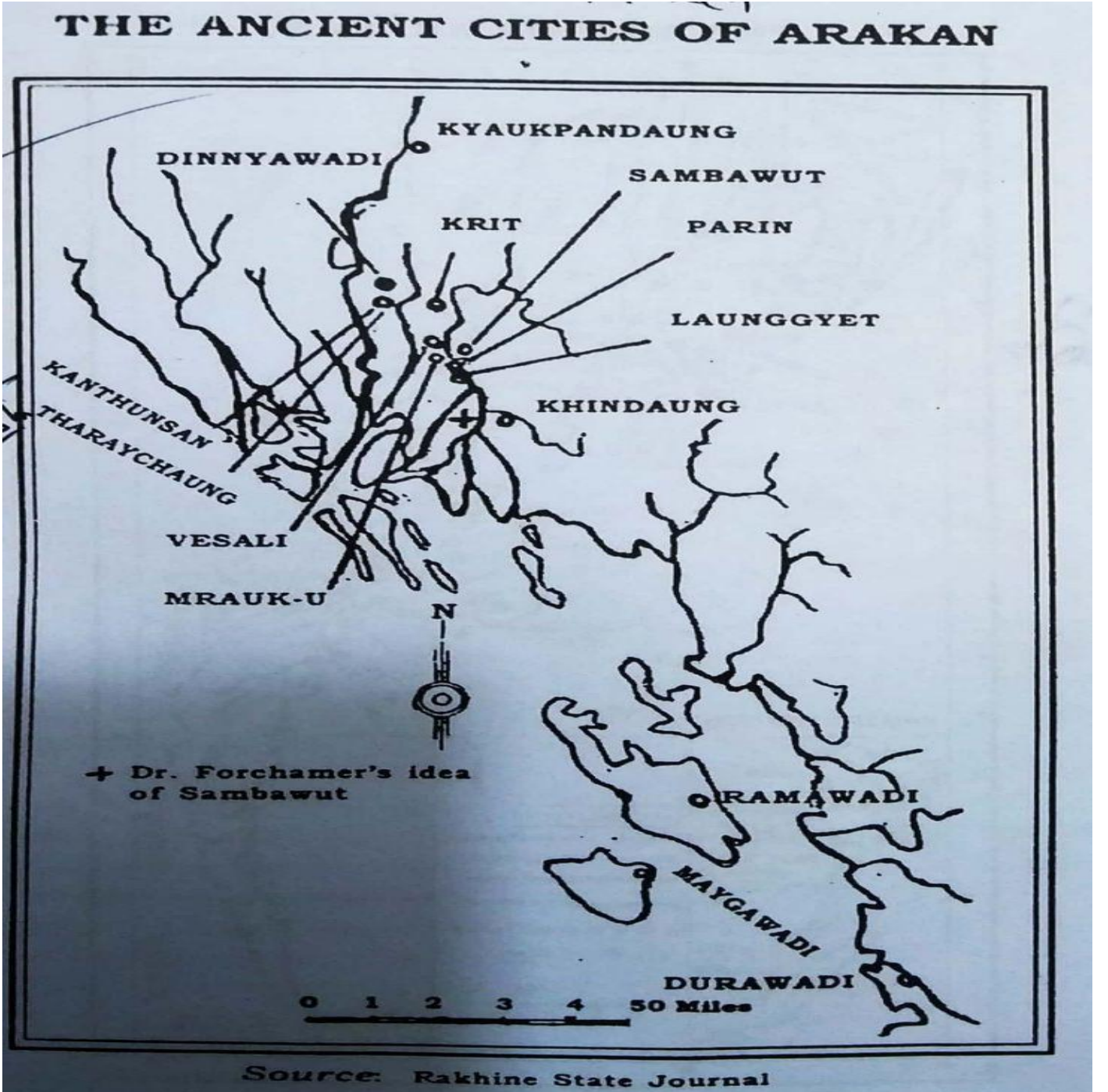
^{২৪*}. ইসলামি বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১৭; মুহাম্মদ ইউনুস, অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস (আরাকান: আরএসও, ১৯৯০), পৃ. ৪।

বুচিদং টাউনের ঠিক ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সেইনডং নদীর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রাকৃতিক সুউচ্চ সেইনডং জলপ্রপাতকে যদি কাজে লাগানো হয়, তবে তা থেকে পানি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। ১৯৬০ সালে তৎকালীন উ-নু সরকার জাতিসংঘের সাহায্য কর্মসূচির অধীনে জলপ্রপাত স্থলে একটি পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। জাতিসংঘের জরিপ মোতাবেক ঐ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরাকানের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করার পরও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রতিবেশী দেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) রপ্তানি করা যেত। কিন্তু ১৯৬২ সালে সমরনায়ক ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটি শুধু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হয়।

আরাকান উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রের লোনাপানি এবং মংডু, পকত, আকিয়াব, চবপিউ, রাহাঙ্গি, স্যাভওয়ে, টংগুপবেং গোওয়া প্রভৃতি শহরগুলোতে অবস্থিত লবণ কারখানা থেকে প্রচুর লবণ উৎপাদন হয়। মংডু, রাহাঙ্গি, আকিয়াব এবং স্যাভওয়েতে অবস্থিত বিভিন্ন লবণ গাঁড়া থেকেও রৌদ্রতাপের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন করা হয়। লবণের এ সকল গাঁড়া সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই পরিচালিত হয়।

আরাকানের শহর : বর্তমানের আরাকানে বেশকিছু শহর রয়েছে। তার মধ্যে ছোট, বড় ও মাঝারি মিলিয়ে এখানে ১৭টি শহরের নাম উল্লেখ করা হলো^{২৫}: ১. বুচিদং, ২. মংডু, ৩. কিয়াউকতাউ, ৪. রাখিদং, ৫. ম্রাউক-উ, ৬. পোল্লগিউন, ৭. মিনবিয়া, ৮. আকিয়াব, ৯. পাউকতাউ, ১০. মেবন, ১১. কিয়াউকপিয়ু, ১২. রামব্রী, ১৩. মেনাউং দ্বীপ, ১৪. টংগু, ১৫. স্যাভওয়ে, ১৬. গোয়া এবং ১৭. অন।

^{২৫}. Jilani, `Regional Geography of Arakan, p. 10.



সমগ্র আরাকান অঞ্চলটি উপরোক্ত ১৭টি শহরের সমন্বয়ে গঠিত। এই শহরগুলোই ১৪,২০০ বর্গমাইলের সমৃদ্ধ আরাকানের রাজনৈতিক ও যাবতীয় বাণিজ্যিক কার্যাবলিসহ যাবতীয় গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে স্যান্ডওয়ে, সিটওয়ে, মায়ু এবং কিয়াউকপিউ হলো আরাকানের প্রাণকেন্দ্র। অন্যদিকে, কালাদান নদীর মোহনায় অবস্থিত একসময়ের রাজধানী শহর আকিয়াব। বর্তমানে আকিয়াব শহরটি আরাকান তথা উত্তর আরাকানের প্রধান সমুদ্র বন্দর। পাহাড়, বনাঞ্চল ও নদ-নদী বেষ্টিত

আরাকানের পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য স্থল পথ অপেক্ষা নদী পথই প্রধান। সমগ্র আরাকানে রেলপথের কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে, সকল ধরনের গাড়ি চলাচলের জন্য পাকা রাস্তার পরিমাণ একেবারেই সীমিত। জোড়াতালি দিয়ে সাবুলে মৌসুমে গাড়ি চলাচলের উপযোগী মাত্র ১৫০ মাইল রাস্তা রয়েছে।^{২৫*} সকল মৌসুমে গাড়ি চলাচলের উপযোগী মাত্র ২টি রাস্তা বিদ্যমান। আকিয়াব থেকে ইয়ানবিয়ন পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ১টি রাস্তা। বুচিদং থেকে মংডু পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার বিস্তৃত অন্য ১টি রাস্তা এবং আরাকান থেকে বার্মায় প্রবেশের জন্য মাত্র ৩টি গিরিপথ, যার মধ্যে ২টি গিরিপথ ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

আরাকানের রাজধানীসহ ছোট ও বড় শহরগুলোকে একটি স্বাভাবিক কাঠামোর মধ্যে এনে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে আরাকান ভূমি নৈসর্গিক বিচারে পৃথিবীব্যাপী মানুষের কাছে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে। তার জন্য সরকারিভাবে আরাকানকে রাষ্ট্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত করে দেশ ও আন্তর্জাতিক জনগণের জন্য স্বাধীন বিচরণ ভূমিতে পরিণত করতে হবে।

আরাকান সীমানায় দিগন্ত জুড়ে সবুজের হাতছানির সাথে সুবিশাল জলরাশির সমন্বয়ের মিশ্রিত বাতায়নে সমুদ্রবন্দর, সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়গুলো আন্তর্জাতিক পর্যটকদের অতি সানন্দে গ্রহণ করে এর অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক হবে। মুসলিম স্থাপনাসহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অত্যাশ্চর্য সব প্যাগোডা মিলে আরাকানকে করেছে সমৃদ্ধ।

রাজধানী শহর : আরাকানি রাজারা আটটি ভিন্ন ভিন্ন শহরে ধারাবাহিকভাবে একটি থেকে অন্য একটিতে স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এ সকল স্থান ছিল; একাদশ শতাব্দীতে থাবেইকটং, ধন্যাবতি বা ধন্যাওয়াদি ও ভেসালি; ১১১৮ খ্রি. পর্যন্ত পাইসা (পাইসা-সামবাইত); পারিন্ ১১১৮-১১৬৭ খ্রি., ক্রিত ১১৬৭-১১৮০ খ্রি., লংগিয়েত ১২৩৭-১৪৩৩ এবং মোহাং (ম্রাউক-উ) ১৪৩৩-১৭৮৫ খ্রি.। আটটি রাজধানীই ছিল আকিয়াব জেলার লেমব্রু নদীর নিকটবর্তী স্থানে।^{২৫**}

অতীতে আরাকানের রাজধানী ছিল মোহং। ইতিহাস প্রমাণ করে, আরাকানের ভূমি ও মানুষের সকল অস্তিত্ব মিশে আছে মোহং নামক শব্দটির সাথে। এই মোহং শব্দটির পরবর্তিত

^{২৫*}. ইসলামি বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১৬; আবদুল মাবুদ খান, 'আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম', পৃ. ১০০।

^{২৫**}. The Rohingyas (A Short Account of Their History and Culture) Dr. Abdul karim, p.13.

ও বিকৃতরূপ হয়ে রোয়াং > রোহাং > রোসাং শব্দের আগমন। বর্তমান সময়ে বিশ্ববাসীর কাছে মোহং স্থানটি পাখুরি কিল্লা বলে পরিচিত।^{২৬} অতঃপর আরাকানের রাজধানী হয় আকিয়াব নামক অসাধারণ শহরটি। ১৮২৫ সালে প্রথম ব্রিটিশ-বার্মা যুদ্ধে ব্রিটিশরা আরাকান দখল করার পর একই বছর ব্রিটিশরা কালাদান নদীর সঙ্গমস্থলে আকিয়াব শহরের গোড়াপত্তন করে। মূলত অনন্তর আকিয়াব হলো ব্রিটিশ অধিকৃত আরাকানের রাজধানী।^{২৬*} তবে এই শহরের গোড়াপত্তন নিয়ে অনেক মিশ্রিত তথ্য থাকায় নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও অনেকটা তথ্য নির্ভর সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, মুসলিম জাতি এই শহরটির প্রাথমিক গোড়াপত্তন করেছে। পারস্যদেশীয় মুসলমানেরাই বর্তমান আরাকানের কেন্দ্রীয় শহর আকিয়াবের গোড়াপত্তন করেন।

ফারসি শব্দ ‘এক্ আব’ থেকেই আকিয়াব নামের উৎপত্তি।^{২৭} আকিয়াব শহরটি আরাকানের সবচেয়ে বড় ও প্রধান কালাদান নদীর মোহনায় অবস্থিত। আকিয়াব শহরটি ১৯৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে এটি আরাকানের প্রধান সমুদ্র বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এটি ছিল একটি ছোট মৎস্য পল্লি। বর্তমানে আকিয়াবে একটি সরিষা তেল ফ্যাক্টরি রয়েছে। যেখান থেকে ভোজ্যতেল উৎপন্ন হয়। আকিয়াবে একটি আইসক্রিম ও কোল্ডড্রিংক ফ্যাক্টরিও আছে। তা ছাড়া আকিয়াব শহরে বেশ কিছু তাঁত শিল্প (Hands Looms) রয়েছে। যেখান থেকে সুতা উৎপন্ন হয়। ১৯৮৯ সালের ১৮ জুন পরবর্তী সময়ে জাভা সরকার আরাকান নামের পরিবর্তনের (রাখাইন) সাথে সাথে রাজধানী শহর আকিয়াবের পরিবর্তন করে। বর্তমানে আরাকানের রাজধানী ‘চাই-তোওয়ে’ (সিন্তে/সিতউয়ি/সিতওয়ে)।

আরাকানের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ এবং বর্মি সরকারের বৈষম্য

প্রাকৃতিক সম্পদের কী বিশাল রত্নভান্ডার রয়েছে আরাকানে তার গভীরতা প্রকাশ পায় তার খনিজ সম্পদে। খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে আরাকান এলাকাটি অতি সম্ভাবনাময় সম্পদশালী। আরাকানের ভূমির নিচে পেট্রোল, কয়লা ও তেলসহ নানান ধরনের খনিজ সম্পদের খবর রয়েছে। এখানে সোনা ও রূপার খনির অস্তিত্বও বিদ্যমান।^{২৭*} কিন্তু আরাকান তথা মিয়ানমারের নিজস্ব জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্বল্পতার অভাবজনিত কারণে খনিজ

^{২৬}. এন.এম. হাবিব উল্লাহ, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃ. ২৯।

^{২৬*}. The Rohingyas (A Short Account of Their History and Culture) Dr. Abdul karim, p. 92.

^{২৭}. এন.এম. হাবিব উল্লাহ, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃ. ১৮।

^{২৭*}. Abdul Mabud khan, The Maghs: A Buddhist Community in Bangladesh, UPL. 1999, p. 4.

সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডারের তল্লাশির প্রয়োজনে খনন কার্যসম্পাদন ও তার উত্তোলন করা আরাকান কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। যার ফলে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ পশ্চিমা সরকারগুলোর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। সেই সুযোগে পশ্চিমা সরকারগুলোর এত বেশি আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয় যে আরাকানের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর, যা হাতিয়ে নেয়ার তাগিদে তারা বৌদ্ধ ও সেনাশাসিত মিয়ানমার সরকারের যাবতীয় অপরাধগুলোকে এড়িয়ে চলে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ড তাই সম্প্রতি প্রতারণামূলকভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর চলা বর্বরতার মূল কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব বলে জানিয়েছেন।^{২৮} সত্তর দশকে কিছু সংখ্যক জাপানি কোম্পানির সহযোগিতায় তেল আহরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অজুহাতে বার্মা সরকার তখন পরিকল্পিত প্রকল্পটি পরিত্যাগ করে। রাহাঙ্গি ও চেদুবা উপদ্বীপে এখনো আদিম পদ্ধতিতে তেল পোড়ানো হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে রাচিদং, চেদুবা, রাহাঙ্গি দ্বীপ ও হান্টার্স উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক তেল মজুদ রয়েছে। বেশকিছু জরিপে দেখা গেছে আরাকানে লোহা, ইউরেনিয়াম, কয়লা, লাইমস্টোন, গ্রানাইট এবং খনিজ ধাতু জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ লুকায়িত রয়েছে। সবচেয়ে সহজ প্রাপ্য সম্পদ হচ্ছে মার্বেল।^{২৮*} অনেক জাপানিজ কোম্পানি আরাকানের মার্বেল আহরণের অনুমতি চেয়ে লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আরাকানের মুসলিম জাতির অধিকতর উপকার সাধিত হবে, এই অজুহাতে বার্মা সরকার সেই সকল উন্নয়ন প্রকল্প বিবেচনা না করেই বাতিল করে দেয়।

মিয়ানমার একটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তামাম দুনিয়ার বেশ কয়েকটি দরিদ্র দেশের মধ্যে বিশেষ করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র দেশ মিয়ানমার। আমেরিকার মতো ইউরোপিয়ানদের ধারণা ও অভিমত যে, বসনিয়া আর রুয়ান্ডার মতো অবিকল মিয়ানমারের আওতাধীন আরাকানের দরিদ্রতাই এই সকল অত্যাচার, জুলুম ও গণহত্যার জন্য দায়ী। তাহলে প্রশ্ন করা যায়, এমন কোনো দারিদ্রের শিকার ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের জনগণ, যেখানে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইজরাইল কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনের আদিবাসী হিব্রু মুসলিম জাতি নিধন চলছে। পৃথিবীতে বহু দেশ রয়েছে যারা দারিদ্রের নিম্নসীমায় বসবাস করে যাচ্ছে কিন্তু শুধু মুসলিম নয় এমন ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে থাকার ফলে, সে সকল দরিদ্র দেশে শক্তিশালী সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর

^{২৮}. কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, নাফ তীরের কান্না, পৃ. ২৮।

^{২৮*}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, পৃ. ৮০।

গণহত্যার মতো জঘন্যতম পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলো হাতে নেয় না। গণহত্যার মতো চরম অপরাধগুলো সংগঠিত করতে হলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শুরু করে সমাজের একই মন-মানসিকতার প্রায় সকল পর্যায়ের লোকজনের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

ফিলিস্তিন-বসনিয়া-রুয়ান্ডাসহ মিয়ানমারের আরাকানে আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম জাতির ওপর ব্যাপক নির্যাতন হচ্ছে, যাকে আমরা এককথায় বলতে পারি এথনিক ক্লিনজিং (Ethnic Cleansing)। একটি প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে (রোহিঙ্গা মুসলিম জাতি) পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য মানব সংগঠিত সকল ধরনের বর্বরোচিত ও জঘন্যতম গণহত্যার চেয়েও নিষ্ঠুর অত্যাচার সংবলিত গণহত্যা, ধর্ষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে মিয়ানমারের বৌদ্ধ নিয়ন্ত্রিত সরকার। এ সকল অত্যাচার ও গণহত্যার শিকার আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দুনিয়ার নিরীহ ও নির্যাতিত জনগণ বলে জাতিসংঘের স্বীকৃতির পরও ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য আচরণ আবারও বিশ্ববিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মূলত আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন আচরণ করার পেছনে যে কারণটি জড়িত, তা হলো—মিথ্যার ছদ্মাবরণে অত্যাচারী মিয়ানমার সরকারের অপরাধগুলোর ভয়াবহতাকে ঢেকে রাখার নামান্তর। বিনিময়ে মিয়ানমার তথা রাখাইন রাজ্যের খনিজ, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নেবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

২০ জুলাই ১৯৮৯ সালে গৃহবন্দি হবার ৬ বছর পর ১০ জুলাই ১৯৯৪ সালের মুক্তি পরবর্তী ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ সোমবার বিকাল— ৩:৩০ মিনিট পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক লেখক অ্যালান ক্রেমেন্টসকে অনুরোধসহকারে নোবেল জয়ী অং সান সু চি বলেন, সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিন আমরা আমাদের দেশে এখনো বন্দি হয়ে আছি।^{২৯}

আমি আজকের মিয়ানমার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পথ চলার সরকার প্রধানকে (প্রধান উপদেষ্টা) বলতে চাই, এসব সুযোগ-সুবিধার পরও সেই বন্দিদশার সময়কার মুহূর্তের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে আপনি নিজের তথা সমগ্র দেশের অত্যাচারের দৃশ্যপট বিশ্বকে জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু আজ আপনার অধীনে চলা রাষ্ট্র যখন আরাকানের আদিবাসী রোহিঙ্গা জাতির উপর গণহত্যা, নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো জঘন্যতম কাজগুলো করছে, তখন আপনি তার কোনো প্রতিকার করছেন না; বরং বিশ্ববিবেককে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন নানা উপায়ে। বিশ্ব মিডিয়াকে পর্যন্ত মিয়ানমারের সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না।

^{২৯}. দ্য ভয়েস অব হোপ; অং সান সু চি, অ্যালান ক্রেমেন্টসের সাথে সাক্ষাৎকার, পৃ. ১৯।

এরূপ ঘৃণ্য আচরণ কেমন করে আপনার বার্মার জনগণের জন্য ‘আত্মার বিপ্লব’^{৩০} হয়, তা আমি সহ সমগ্র বিশ্বে আজ প্রশংসিত!

আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র কেন্দ্রিক স্বার্থ যখন জড়িত হয়, তখন মানবতার পক্ষের কণ্ঠস্বর ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ অধ্যুষিত ৫০ মিলিয়নের অধিক জনগণের সরকার ও সেনাবাহিনীর নির্লিপ্ত অত্যাচার (একনায়কত্ব ও সু চি’র সরকার) ভীতির মধ্যে মিয়ানমার পৃথিবীর মানচিত্রে এখন হয়ে উঠেছে এক অরওয়েলিয়ান দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্ন মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার দুঃসম্পন্ন। দুঃস্বপ্নকে আরও বাড়িয়ে দেয় বহির্বিশ্বের চীন, ভারত, রাশিয়া, ইজরাইল ও আমেরিকার মতো দেশগুলোর পক্ষ থেকে মিয়ানমার সরকারকে নিরঙ্কুশ সহযোগিতা ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে।

জেনারেল নে-উইন ১৯৬২ সালের মার্চে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর দেশের নতুন ‘রেভ্যুলেশনারি কাউন্সিল’ সংবিধান রদ করে তৎক্ষণাৎ বহির্বিশ্বের সাথে মিয়ানমারের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। যাতে করে ১৩৫-১৪০টি ক্ষুদ্র জাতির উপর তিনি ক্রমাগত অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে যেতে পারেন।

চীন, ভারত ও আমেরিকাসহ বহু এশীয় ও প্রশান্ত অঞ্চলের দেশগুলো মিয়ানমারের নিপীড়ক সরকারের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে শুধুই অর্থনৈতিকভাবে নিজেরা লাভবান হচ্ছে তা না, বিনিময়ে মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টত সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের দেশান্তরী করতে। এখানে মানবাধিকার অগ্রাধিকার তো পায়নি; বরং লুণ্ঠিত হচ্ছে সুবিচারও।

চীন ও ভারত দীর্ঘকাল যাবৎ যে পরিমাণ ব্যবসায়িক সুবিধা মিয়ানমার থেকে গ্রহণ করে আসছে, সে পরিমাণ অর্থ ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনে মিয়ানমারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক মুখের পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য। এই অসৎ ও বিকৃত পদ্ধতির কার্যক্রমের শুরু যোগ্যতাহীন সু চিকে লাইম লাইটে আনার মধ্য দিয়ে। তার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা মিলে অযোগ্য অং সান সু চিকে অস্বাভাবিকভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে।

অতঃপর সেনাশাসিত সরকারের সামরিক সদস্যদের বেসামরিক পোশাক পরিয়ে গণতন্ত্রের নামে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করে। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ,

^{৩০}. অং সান সু চি মিয়ানমারে গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেন মার্টিন লুথার কিং-এর অনুসরণে; গণতন্ত্রের সেই আন্দোলনকে তিনি বার্মার ‘আত্মার বিপ্লব’ বলে ঘোষণা করেন।

বার্মার নাম মিয়ানমারে রূপান্তরের মাধ্যমে। সে সকল ব্যবসায়িক চক্রান্তের অংশ হিসেবে ২০১০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী উপনির্বাচনে সু চিকে উৎসাহিত করা হয় অংশ নিতে। সেই নির্বাচনে সু চি'র NLD পার্টি স্বউদ্যোগে অংশ নেয় এবং জয়লাভ করে।

এ সকল কাজের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পার্টিগুলো প্রমাণ করতে চায় যে, মিয়ানমার ফ্যাসিবাদী সামরিক সরকার ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের পথে হাটছে। অতঃপর থেইন সেইনের অলিখিত ও অঘোষিত দূত হিসেবে পশ্চিমাবিশ্ব সফর করেন সু চি। সফরে সু চি পশ্চিমাবিশ্বসহ সবাইকে মিয়ানমারের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে আমন্ত্রণ জানান। গণতন্ত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অন্ধকার রাষ্ট্রের প্রধান থেইন সেইন জাতিসংঘ সফরের নাটক সাজিয়ে বান কি মুনসহ পশ্চিমা বিশ্ব নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।^{৩১} পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাবিককরণের শেষ যে নাটক মঞ্চায়ন করেছেন তা বিশ্ববিবেককে হাস্যময় করে তুলেছে।

জনসংখ্যা : একটি রাষ্ট্র কিংবা স্থানের মূল উপজীব্য বিষয় মানুষ। তাই আরাকানের মানুষগুলোর সংখ্যা বের করা আমার গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কিন্তু আরাকানের নিয়ন্ত্রণ মিয়ানমারের সামরিক জাভা ও তাদের আদর্শিত নামমাত্র সরকারের হাতে। বর্তমানে এটি মিয়ানমারের সামরিক জাভা শাসিত রুদ্ধদ্বার দেশের একটি প্রদেশ হওয়াতে সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জনসংখ্যার গণনা উভয়ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

স্বাধীনতা পরবর্তী আজ অবধি মিয়ানমারের অধীনে আরাকান এলাকায় কোনো প্রকার আদমশুমারিও হয়নি। শোণিত পিপাসু জাভা সরকারের একনায়কত্ববাদী অন্ধকার ত্রাসের রাজত্বে লুণ্ঠিত অথচ একই সাথে স্পন্দনশীল আধ্যাত্মিক একটি সমাজের জনগণের জীবন ও সংখ্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া বহির্বিশ্বের জন্য একপ্রকার কষ্টসাধ্য বিষয় ও বলা যায় নিষিদ্ধ। তাই আরাকানের জনসংখ্যার নিখুঁত ও সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা কঠিন ও দুরূহ কাজ। যার ফলে আরাকানের জনসংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন জন ও মহলে স্পষ্টত যথেষ্ট পরিমাণ মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর গবেষণার স্বার্থে আরাকানের জনসংখ্যার পার্থক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিচে তুলে ধরা হলো—

এক. আরাকানের বাইরে মিয়ানমারের বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে। সমগ্র মিয়ানমারে প্রায় ৭০ লক্ষ মুসলমানদের বসবাস। এর অর্ধেকের বেশি আরাকানে

^{৩১}. ড. হাবিব সিদ্দিকী, Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims by Burmese Rakhine Buddhists in Arakan State of Myanmar, এশিয়ান ট্রিবিউন, ৩ নভেম্বর, ২০১২।

বসবাস করে। বেসরকারি হিসেব মতে, আরাকানের বর্তমান (০৫.১২.২০১৬) জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। কোনো একসময় আরাকানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সে দেশের সরকারের দাবি হলো, বর্তমানে ‘মুসলমান ও রাখাইন’ জনসংখ্যা প্রায় সমান।^{৩২}

দুই. বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার ভাষ্য ও আরাকানের মুসলিম গবেষক ও লেখকদের বিশ্লেষণমূলক মতানুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষেরও অধিক মুসলমান। যা প্রায় আরাকান অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০%।^{৩৩}

তিন. প্রফেসর ড. আবদুল করিমের মতে, প্রকৃত পক্ষে আরাকানে আদমশুমারি না হওয়ার কারণে জনসংখ্যার প্রকৃত চিত্র দেয়া সম্ভব নয়। তবে এক হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে এর জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ এবং এর বাইরে রয়েছে প্রায় দেড় মিলিয়ন (১৫ লক্ষ) রোহিঙ্গা মুসলিম; যারা আরাকান থেকে বহিস্কৃত হয়েছে ১৯৪২ সাল থেকে। বর্তমানে আরাকানের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ এবং মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সমান। অর্থাৎ ২০ লক্ষ বৌদ্ধ, ১৮ লক্ষ মুসলমান এবং অবশিষ্ট ২ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী^{৩৪}, হিন্দু ও খ্রিষ্টান।^{৩৫}

চার. ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়া ওয়াচ তাদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, আরাকানে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ লোকের মধ্যে আনুমানিক প্রায় ১৪ লক্ষ লোক হলো রোহিঙ্গা মুসলিম।^{৩৬}

আরাকান রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমানুপাতিক এই বৃদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ব্যাপকভিত্তিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আরাকানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রিচার্ড এম. ইটন তার গবেষণামূলক বইতে লিখেছেন-^{৩৬*} ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে

^{৩২}. ইকতেদার আহমেদ : সাবেক জর্জ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক; সোমবার, ৫ ডিসেম্বর ২০১৬, যুগান্তর।

^{৩৩}. দৈনিক জনতা, ১৭ নভেম্বর ১৯৯১; দৈনিক সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০; দৈনিক আজাদ, ১৫ ও ১৭ নভেম্বর ১৯৯১; ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২৬; Mohammed Yunus, A History of Arakan: Past & Present, Chittagong, Magenta Colour, 1994, P.12; Manifesto of Arakan Rohingya National Organization, Arakan, 1998, P.2.

^{৩৪}. সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে বলে যারা বিশ্বাস করেন, তাদেরকে সর্বপ্রাণবাদী বা Animist বলা হয়, মুস্তাফা মাসুদ, ড. আবদুল করিম স্যারের রোহিঙ্গাদের ইতিহাস বইয়ের অনুবাদক।

^{৩৫}. Dr. Abdul Karim, The Rohingyas (A Short Account of their History and Culture), P.14.

^{৩৬}. The Return of the Rohingyas to Burma: Voluntary Repatriation or Refaulement? Human Rights Watch/Asia, U.S.A; Issue Papers of US Committee for Refugees, Washington D.C. 20036, March, 1, 1995, P.3.

^{৩৬*}. The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760).

তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি (মৃত্যু ১২০৬ খ্রি.) ১২০৪ সালে বাংলা জয় করার মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এমন এক সময়ে কাকতালীয়ভাবে এতদঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গা নদীর প্রধান প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বাংলার প্রাচীন নগরীগুলো বিরান হতে থাকে। বিপরীত দিকে অন্যস্থানে নতুন উর্বর জমির আবির্ভাব হয়।

জনশ্রুতি রয়েছে যে, নতুন ভূমিতে যেমন করে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপাদন হতো তেমনি তাল মিলিয়ে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটত। এই ভূমিতে নতুন কোনো ধর্ম বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারে ধর্মীয় বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সুখকর। উন্নত জীবনযাপনের ভূমি উর্বরতার সহযোগিতাকে এক অনুদান মনে করে সে সময়কার যে ধর্মের আহ্বান আসত, সাধারণ মানুষ তাই গ্রহণ করত। ঠিক এই সময়ে প্রথমে তুর্কি, আফগান বা পাঠান সাম্রাজ্যের আগমন হয়। যার ফলে আরাকানসহ বিশাল সাম্রাজ্যের নতুন ভূমিতে ইসলামের ত্বরান্বিত বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইসলামের আগমনের পূর্বকাল থেকেই বাণিজ্যিক কারণে আরাকানের সাথে আরবের বণিকদের যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদে ইসলামের আগমনের প্রারম্ভিক কালেই ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়।

ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামে নিযুক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ‘রবার্টসন’ আরাকান অঞ্চলের প্রথম বেসামরিক শাসক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের নিকট আরাকান সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে বলেন, আরাকানি এবং বর্মিরা অলস। তারা কোনো কঠোর পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আরাকান অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ পতিত জমি ও বনাঞ্চল পড়ে আছে, যা কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক জীবন মান উন্নত করা সম্ভব। এমতাবস্থায় জমি চাষ ও অন্যান্য কাজের জন্য বাংলা বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে কৃষকদের এনে আরাকানে বসবাসের সুযোগ করে দিলে আরাকানি সমাজব্যবস্থার উপকার হবে। ম্যাজিস্ট্রেট রবার্টসনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ‘মি. প্যাটন’ একই অভিমত ব্যক্ত করেন। উক্ত প্রতিবেদনে আরাকানের জনসংখ্যাবিষয়ক এক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। যেখানে মগ ৬০ হাজার, মুসলমান ৩০ হাজার ও বর্মি ১০ হাজারের উল্লেখ রয়েছে।^{৩৭} মি. রবার্টসন ও মি. প্যাটনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা থেকে কত লোক আরাকানে গিয়েছিল তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে ব্রিটিশ প্রতিবেদনে থেকে এটা প্রমাণিত যে, ব্রিটিশদের

^{৩৭}. A.C Banerjee, The Eastern Frontier of British India, Calcutta, 1964, P. 351.

আরাকান দখলের সময়ে সেখানে ইতোমধ্যেই ৩০ হাজার মুসলমানের বসবাস ছিল এবং এই ৩০ হাজার মুসলমান আরাকানে পূর্ব থেকেই বসবাস করছিল। তাদের বংশধর ও উত্তরসূরীরা পূর্বের জনসংখ্যাকে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করেছে। নৈসর্গিক আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রাথমিক বিন্দু বা শনাক্তকরণ প্রমাণাধি (সূচনা পয়েন্ট) পেয়েছি যা ১৮২৫ সালের কাছাকাছি। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ হাজারের কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যা মোট জনসংখ্যার ৩০%।

আরাকানে ব্রিটিশ রাজত্ব শুরুর পর মুসলমানদের আগমনের জয়যাত্রা ধেয়ে আসে আরাকানের দিকে। এ সময় অনেকেই ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে আসতে উৎসাহিত হয়। কেননা আরাকানের চাষাবাদকে উন্নত করার জন্য আগত মুসলমানদের বসতি স্থাপন ছিল অত্যন্ত জরুরি।^{৩৮} এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-^{৩৯} ‘আরাকানে চাষযোগ্য জমিগুলো চাষের আওতায় আনার পর চট্টগ্রামের চাষিরা কৃষিকাজ উন্নয়নের সর্বাধিক পারঙ্গম হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং অধিকাংশ আরাকানি ভূমি মালিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, অন্য যেকোনো জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে চট্টগ্রামের চাষিরাই কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, তারা অধিকতর সন্তোষজনক কর্মফল পরিশোধে ইচ্ছুক এবং তাদের দ্বারা জমির সঠিক উন্নয়ন সম্ভব।’

আরাকানের জনসংখ্যার ক্রমানুপাতিক আদমশুমারি না থাকার পেছনে কী অজ্ঞতা রয়েছে তা খুঁজে না পাওয়া গেলেও এটা বলা যায়, বর্তমানে মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা লুকানোর জন্যই আদমশুমারির সার্ভে পরিচালিত হয় না। তারপরও বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে বেশকিছু জরিপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো : ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্পষ্ট প্রতিবেদন মোতাবেক ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ জনের মধ্যে ৩০% অর্থাৎ ৩০ হাজার ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী। ১৮২৬ সালের ৩০ হাজার আরাকানি মুসলমান ছিলেন প্রথমদিকে বসতি স্থাপনকারীদের বংশধর; যারা ছিলেন আরবীয়, পার্সিক, মোঘল ইত্যাদি। ব্রিটিশরা বার্মা আয়ত্রে নেয়ার পর বিদেশিদের আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করে। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, এককভাবে শুধু আরাকানের আকিয়াব জেলাতেই মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪৭ জন। যা মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার ৩৩%।^{৪০} সে হিসাবে গোটা আরাকানসহ

^{৩৮}. Prabasi, Vol. VII, 1351 B.S P. 242.

^{৩৯}. R.B. Smart, British-Burma Gazetteer: Akyab District, Vol. A, P. 129.

^{৪০}. R.B. Smart, British-Burma Gazetteer: Akyab District, Vol. A (Rangoon: Burma Government Printing & stay, 1959) P. 83.

মিয়ানমারে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায়; ৩৩% = ১,৭৮,৬৪৭ জন হলে, ১০০% = $১৭৮৬৪৭ \times ১০০ \div ৩৩$ অর্থাৎ ৫,৪১,৩৫৫ জন। অন্যদিকে, স্বাভাবিকের চেয়ে অধিকতর বিস্ময়ের সাথে দেখা যায় যে, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে আরাকানের মোট লোকসংখ্যা দেখানো হয় মোট ১২,৯৯,৪১২ জন। যার মধ্যে বৌদ্ধ ৮,৭৮,২৪৪ জন, মুসলমান ৩,৮৮,২৫৪ জন, হিন্দু ৩,২৮১ জন, খ্রিষ্টান ২,৭৫৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল ২৫,৮৮০ জন।^{৪১} তবে ইউনিয়ন অব বার্মার অধীনের এই আদমশুমারি নিয়ে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। কেননা, এখানে বার্মা ও ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আরাকানের মুসলিম জাতি থাঙ্গাইক্যা, জেরবাদি, কামানচি ও রোহিঙ্গা-এ ৪টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আরাকানসহ সমগ্র মিয়ানমারে বসবাসকারী মুসলমানদের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে রোহিঙ্গা গোষ্ঠী যেমন প্রভাবশালী ও ঐতিহ্যমণ্ডিত তেমনি সংখ্যায়ও তারা অধিক, আরাকানের মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৮০%। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে বার্মার জাতি সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে ঘোষণা করে যে, আরাকানের সকল মুসলিম গোষ্ঠীই বিদেশি এবং তারা নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত—^{৪২}

চট্টগ্রাম কোলার (রোহিঙ্গা)	১,৮৬,৩২৭ জন
বাঙালি কোলার	১৫,৫৮৬ জন
ভারতীয় কোলার	৩,৫৮৭ জন
উড়িয়া (উড়িষ্যার) কোলার	৩,৫২৭ জন
মোট—	২,০৯,০২৭ জন

১৭৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে বর্মিরা জুলুম ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শান্ত আরাকানের আদিবাসীদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে খুশি হতে পারেনি। তাই বর্মিরাজ বোধপায়ার উত্তরসূরীরা ১৯৮১ সালে এসে আরাকানের আদিবাসী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ‘কোলার’ অর্থাৎ ‘বিদেশি’ বলে, নিজ পৈত্রিক ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করার যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। যা সভ্য পৃথিবীতে কোনো মানবসমাজ মেনে নিতে পারে না। কিন্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে একপ্রকার মেনে নিতে হচ্ছে। কেননা, তারা মুসলমান।

^{৪১}. Government Official Population Census of Arakan in 1931, Union of Burma.

^{৪২}. Dhaka Digest, Vol. V, No. 4, 1991, P. 17.

প্যালেস্টাইন-সিরিয়া-লিবিয়া, ইরাক-আফগানিস্তান, বার্মা-ভারত-বসনিয়াসহ আজ পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের মানবাধিকার বলে কিছু থাকতে নেই। তাহলে বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো সোচ্চার হবেইবা কেন! উপরন্তু আইএমও-এর মতো সংগঠনগুলো বাংলাদেশের ভূমিতে রোহিঙ্গাদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রিফিউজি রোহিঙ্গাদের নামমাত্র তালিকাভুক্তির মাধ্যমে নামমাত্র অর্থ জোগান দিয়ে যাচ্ছে।

আইএমও-এর মতো সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও মানবাধিকার তথা জীবন, ইজ্জত ও নিরাপত্তার বিষয়ে সোচ্চার না হয়ে আমাদের মতো দেশগুলোকে চাপ দিয়ে আসছে মানবতার দরজা নামক দেশের সীমান্ত রেখা খুলে দেয়ার জন্য। যাতে করে আরাকানের সহজ-সরল সকল মুসলিম রোহিঙ্গা জীবনের তাগিদে ভূ-সম্পত্তি রেখে বাংলাদেশের মতো নানান দেশে প্রথমে রিফিউজি হয়ে প্রবেশের মধ্য দিয়ে একসময় অস্তিত্ববিহীন জাতিতে পরিণত হয়। কোনো একসময় যদি বিশ্ব সম্প্রদায়ের হঠকারি সিদ্ধান্তের কারণে রোহিঙ্গা মুসলিমদের এহেন কালি নির্ধারিত হয়, তবে বিশ্বসভ্যতার জন্য কোনো শান্তির সুবর্তা বয়ে আনবে না।

আন্তর্জাতিক মহলসহ সকলের নিকট স্পষ্ট যে, ১৯৮১ সালে বার্মা সরকারের রোহিঙ্গা বিষয়ক পরিসংখ্যান ও ঘোষণাপত্রটি ছিল ভুল। মূলত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা নিতান্ত কম এটি দেখাবার জন্যই বর্মি সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংখ্যার বিকৃতি ঘটিয়ে তা প্রচার করেছিল।

২০০১ সালের পূর্বেকার আরাকানি মুসলিম লেখকদের মতানুসারে প্রায় ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমান বিভিন্ন সময় নির্যাতনের মুখে আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এই ১২ লক্ষ মানবসন্তান বাস্তবহীন হয়ে সৌদি আরবে ৫ লক্ষ, বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার, পাকিস্তানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ৫৫ হাজার, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ৪৩ হাজার এবং অন্যান্য দেশে ১০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমান আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হয়েছে।^{৪৩}

১৯৩৭ সালে বার্মায় ব্রিটিশ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদনের পর বর্মিশাসকরা ক্ষমতার প্রাথমিক স্বাদ পেয়েই পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গা বাধিয়ে ১৯৩৮ সালে সারাদেশে প্রায় ৩০ হাজারের মতো রোহিঙ্গা ও বর্মি মুসলমানকে হত্যা করে। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

^{৪৩} হাজী এম এ কালাম, 'রাষ্ট্রহীন এক মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা; দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ ডিসেম্বর ২০০১।

শেষ সময়ে বর্মীদের সহযোগিতায় আরাকানের মগেরা রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা ৪২-এর ম্যাসাকার হিসেবে কুখ্যাত। এ ম্যাসাকার বেসরকারি হিসাব মতে, প্রায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং ৫ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গাকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়।^{৪৪} ১৯৫৮ সালে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলমান আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।^{৪৫} ১৯৭৮ সালে ২ লক্ষ ৭০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছিল বর্মি সরকার।^{৪৬} অন্য তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭৮ সালে ৩ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বর্মি নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য যখন বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় ঢুকেছিল, তখন জানা যায় আরাকানে মুসলমানদের জনসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক।^{৪৭} অতঃপর ১৯৯১-৯২ সালের ২৬ জুনের মধ্যে জেনারেল সমং ২,৭০,৫৫৮ জন রোহিঙ্গা মুসলমানকে আরাকান থেকে বিতাড়িত করেন।^{৪৮}

১৯৩৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বার্মা কর্তৃপক্ষের নানাপ্রকার নির্যাতনে আরাকান ভূমি থেকে প্রায় ১২ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা মুসলমান দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর ২০১২ সালে আরাকানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় দুশতাধিক^{৪৮ক} রোহিঙ্গা মুসলমান হত্যা পরবর্তী জীবন বাঁচাতে অসংখ্য রোহিঙ্গা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরে কাল্পনিক ও নাটকীয় ঘটনার উপর ভিত্তি করে মিয়ানমারের সু চি সরকারের লেলিয়ে দেয়া সামরিক বাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লোমহর্ষক বর্বরোচিত নৃশংস হত্যা ও অত্যাচারে জীবনের সর্বশেষ নিরাপত্তার তাগিদে দেশত্যাগে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাধ্য হয়। যার মধ্যে অন্তত ৭০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। ৯ অক্টোবর ২০১৬ পরবর্তী ২০১৭ সালের মার্চ মাসের পূর্বের নারকীয় হত্যা ও নির্যাতনকে ‘জাতিগত নির্মূল’ অভিযান বলে অভিহিত করেছেন, রাখাইনে (আরাকান) জাতিসংঘের বিশেষ দূত।^{৪৯}

^{৪৪}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, পৃ. ৭৩।

^{৪৫}. ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, সমকালীন বিশ্বে সংখ্যালঘু মুসলমান, এম. আবদুল্লাহ এন্ড সন্স।

^{৪৬}. ড: মো: মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, পৃ. ৬৭।

^{৪৭}. Dr. Abdul Karim, The Rohingyas (A Short Account of Their History and Culture), P. 95.

^{৪৮}. আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসী, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

^{৪৮ক}. ইকোনমিস্ট; মুহাম্মদ হাসান শরীফ, নয়াদিগন্ত, পাতা-৮, ২৪ আগস্ট ২০১৭।

^{৪৯}. গার্ডিয়ান থেকে নয়াদিগন্ত, বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭।

নানা অপকৌশলের কারণে আরাকানে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তার একটি প্রমাণ-মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি ২০১৮ ইউনিসেফের (জাতিসংঘ শিশু তহবিল) মুখপাত্র ম্যারিস্সি ম্যারকাদো সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, রাখাইন রাজ্যের মধ্যাঞ্চলে আটকে আছে ৬০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা শিশু, মানবেতর জীবনের মধ্যে থেকে যাদের প্রত্যেকেই অতিদ্রুত মরতে পারে।^{৫০} এভাবে বিভিন্ন সময়ে জুলুম-নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণ ও বিতাড়নের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দিনকে দিন অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। তদুপরি আরাকানি মুসলিম লেখকদের ২০০১ পরবর্তী পরিসংখ্যানটি উত্তর আরাকান বিশেষত বুচিদং ও মংডু এলাকার শুধু পরিসংখ্যানের জন্য প্রযোজ্য। দুই, তিন ও চার নম্বরের পরিসংখ্যানের সাথে ১৯৩৮, ১৯৫৮, ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ এবং ২০১৬-১৭ সালের বিতাড়িত ও নিহত মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করলে আরাকানি মুসলিম লেখকদের পরিসংখ্যানের চেয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উদ্ধৃত সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সমগ্র মিয়ানমারে প্রায় ৭০ লক্ষাধিক মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তার মধ্যে আরাকানে বসবাসকারী ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৬০% তথা ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার বর্তমান পরিচয় মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর রোহিঙ্গা জনগণ। এই ৩০ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগণের অধিকাংশ মাতৃভূমি আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে শরণার্থীর জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। হাজারো নির্যাতনের পরও মোটামুটিভাবে বলা যায় বর্তমানে আরাকানের মাটিতে ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানের বসবাস রয়েছে।

^{৫০}. ইউএন নিউজ সেন্টার, ১০ জানুয়ারি ২০১৮।